হিমালয় পরিভ্রমণ

ভগবদলীলামৃত—সীতাচিত্র—আদর্শ গৃহিনী
প্রবন্ধমুকুল রচয়িত্রী
প্রণীত—



৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট, অরুণোদয় আর্ট প্রেসে এস, কে, বসু দ্বারা মুদ্রিত

ও বিজয় গোপাল মুখার্জ্জি (মুঙ্গের)

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভূমিকা

শ্রীমতী রত্নমালা দেবীর "হিমালয় পরিভ্রমণ" ধারাবাহিক ভাবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ধারাবাহিক বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকে ইহা গ্রন্থাকারে গ্রথিত দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। "পরিশিষ্ট"টি নূতন—পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী স্বনামধন্য সুকবি ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দৌহিত্রী—আনুষ্ঠানিক হিন্দুগৃহের কুলবধূ। তাঁহার মত মহিলার পক্ষে দেশভ্রমণ নানা বিঘ্ন-সঙ্কুল। কিন্তু সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি আসমুদ্র হিমাচল ভারতের নানাতীর্থ দর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার বদরীনারায়ণ ও কেদার যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ ভ্রমণের ফলস্বরূপ আর একখানি গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—এরূপ আশা আছে।

এই হিমালয়ভ্রমণ শুধু ভ্রমণ বৃত্তান্ত নহে। পথের বিবরণ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণন অনেক ভ্রমণবৃত্তান্তেই পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রত্যেক স্থল একটী গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে অভিষিক্ত। ভক্তিমতী হিন্দুমহিলা কি ভাবে তীর্থদর্শন করেন—কোন্ অভীষ্টের উদ্দেশে তিনি দুর্গম পথ-ক্লেশ ও আদিভৌতিক দুঃখ অম্লানমুখে সহ্য করেন, এবং অবশেষে গম্য ধামে পৌঁছিয়া তাঁহার হৃদয় কি ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়—এই গ্রন্থপাঠে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে পথের সুবিধা সুযোগ—কোথায় কোন্ চটী, কোন্ চটীতে কিরূপ

থাকিবার ব্যবস্থা, কোথায় কি ধর্ম্মশালা ও দেবমন্দির এবং বিগ্রহাদি আছে, তাহারও বিশিষ্টবিবরণ গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ দেখিবেন। যিনি প্রকৃতির উপাসক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হয়, নিসর্গের ছবি যাঁহার অন্তরে আনন্দের উৎস উৎঘাটিত করে—এরূপ পাঠকও এই গ্রন্থ পাঠে 'দেবাত্মা' হিমালয়ের স্নিগ্ধ গম্ভীর, সুষমার সাক্ষাৎ পাইয়া পুলকিত হইবেন। সেই জন্য আমার মনে হয় যে, এই গ্রন্থ সকল শ্রেণীর পাঠকেরই চিত্ত বিনোদন করিবে। ইহার বহুল প্রচার দেখিলে আমি সুখী হইব।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৪ সাল।

হিমালয় পরিভ্রমণ



বদরী-বিশাল যাত্রা

আজ ২৭শে চৈত্র আমরা কাশীধাম হইতে বদরী-বিশাল গমনের জন্য শিখরোল ষ্টেশনে আসিয়া ১০টা ২৫ মিনিটে পঞ্জাব মেলে উঠিলাম। যাত্রীর মধ্যে আমরা ছয় জন স্ত্রীলোক আর কলিকাতা মেটেবুরুজ-নিবাসী ৺দুর্গাচরণ রক্ষিতের পুত্র শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র রক্ষিত—আমাদের দলের প্রধান পাণ্ডা। ইনি তরুণ বয়সেই অতি ভক্তিমান, ধর্ম্মপরায়ণ ও উদার হৃদয়—ছেলেবেলা হইতেই একটা দেশ ভ্রমণের নেশা আছে। ইনি অল্পবয়সেই বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। আর আমার সঙ্গে আছেন আমার চিরজীবনের সঙ্গী সাথী—সেই অনাদিদেব বিশ্বনাথ বাণলিঙ্গ ও রাধাগোবিন্দ। আমি তাঁহাকে গলায় বাঁধিয়া বদরী-বিশাল যাত্রা করিলাম। বহুদিনের সাধ ছিল যে একবার হিমালয় পদপ্রান্তে গমন করিয়া প্রভুর চরণ-কমল দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিব। আজ কাশীধামে গৌরবাবুকে বদরী-বিশাল যাত্রার সঙ্গী পাইয়া সেই উদ্দেশ্যেই চলিলাম। আর কাশীধাম হইতে ৺কেদারনাথের পাণ্ডা বিশ্বনাথ

মুকুল আমাদের পথপ্রদর্শকরূপে চলিলেন। আমাদের গাড়ী যখন মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে নক্ষত্র বেগে ছুটিল আমরা জয় বদরী-বিশাল বলিয়া মোটঘাট গুছাইয়া বসিলাম। চক্ষুর নিমেষে পঞ্জাব মেল ধূম্ররাশি উচ্ছ্বসিত করিতে করিতে চলিল। বেলা ১টার সময় আমরা প্রতাপগড় আসিলাম। ৩টার সময় লক্ষ্ণৌ পৌছিলাম। লক্ষ্ণৌতে গাড়ি কিছুক্ষণ থামিল। লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে খুব ভিড়—শত শত যাত্রীর ওঠা নামা গোলমাল হাকা-হাঁকি; তারপর ফলওয়ালা, পুরিসন্দেসওয়াল', দুধরাবড়িওয়ালা, লাক্ষ্ণৌর পুতুল খেলনা ইত্যাদির ভিড়ে খানিকটা বিব্রত করিল। আমরা কিছু ফল কিনিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময় গাড়ির বাঁশী বাজিল আবার বায়ুবেগে ট্রেণ চলিল। শুনিলাম রাত্রি ১২টার সময় লুক্সরে গাড়ি বদল হইবে। গাড়ীতে বসিয়া গৌরবাবুর মাসীমা বদরী যাত্রার গল্প বলিতে লাগিলেন, আমরা গল্প শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে দিন অবসান হইল। সন্ধ্যার সময় ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া কিছু জলযোগ করিয়া এক পার্শ্বে কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিলাম। রাত্রি ১২টার সময় গৌরবাবু আমাদের লুক্সরে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। গাড়ি লুক্সর আসিল, আমরা পঞ্জাবমেল হইতে নামিয়া অন্য গাড়িতে উঠিলাম। রাত্রি তিনটার সময় হরিদ্বার আসিয়া পৌছিলাম। মুটেরা মোটঘাট নামাইয়া লইল। তখনও রাত্রি আছে দেখিয়া অগত্যা ষ্টেশনের এক পার্শ্বে কম্বল বিছাইয়া সতর্ক হইয়া শয়ন করিলাম। পাছে জিনিষপত্র চুরি যায় এজন্য গৌরবাবু বসিয়া রহিলেন। ভোর ৫টার সময় দুই

খানা একাগাড়ি ও একখানা মাল লইয়া যাইবার টানাগাড়ি আসিল। পাণ্ডা গাড়ি ঠিক করিয়া আমাদিগকে ডাকিলেন। তখন মোটঘাট গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া গৌরবাবু আমাদের লইয়া একা করিয়া হরিদ্বার সহরের মধ্যে আসিলেন। রাস্তার মধ্যেই সুরজমল ঝুনঝুনওয়ালার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা দেখিলাম। গৌরবাবু পাণ্ডাকে সঙ্গে করিয়া ঐ ধর্ম্মশালার উদ্দেশ্যেই গমন করিলেন। কিন্তু আমাদের আসিবার পূর্ব্বে সেই ধর্ম্মশালা কেদার-বদরিকা-যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; অগত্যা সেখানে স্থান না থাকায় পাণ্ডা-ঠাকুর আমাদের মহাত্মা ভোলাগিরির আশ্রমে লইয়া আসিলেন। আশ্রমের বহির্দেশে ভোলাশ্রম লেখা আছে, বাটীটি দ্বিতল একেবারে গঙ্গার উপর। স্থানটী বেশ নির্জ্জন, এই স্থানে আমরা আসিয়া আশ্রয় লইলাম। জিনিষপত্র নামাইয়া মুটেরা রাখিয়া গেল, আমরা গঙ্গার উপরে একতলায় দুইটী কুঠারি লইলাম—একটীতে গৌরবাবু, তাঁহার ভগ্নী ও দুই দাসী রহিলেন, অন্যটীতে আমরা রহিলাম। তখন পাণ্ডারা আসিয়া বৃহৎ বৃহৎ খাতাপত্র লইয়া যাত্রী নির্ণয় করিতে আসিলেন। তাঁহাদের নিকট চৌদ্দ পুরুষের পরিচয় দিতে দিতে অস্থির হইতে হয়। আবার পাছে পাণ্ডা প্রভুরা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া অভিসম্পাত দেন, এই ভয়ে অবনত-মস্তকে সকলের নিকট পরিচয় দিতে হইবে। তবে আমাদের নেতাটি শক্ত, সহজে বড় কেহ ঘেঁসিত না। যাহা হ'ক পাণ্ডা প্রভুরা আসিয়া নিজ নিজ যাত্রী স্থির করিয়া লইলেন। আমরা হরিদ্বারের গঙ্গার পবিত্র বারিতে স্নান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম

এবং পূজা আহ্নিক করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতে গেলাম। মুগের ডাল আতপ চাউল দিয়া খেচরান্ন করিয়া আলু ভাজিয়া ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিলাম। আহারান্তে এই গঙ্গাতটে বসিয়া ভাগীরথীর মনোমুগ্ধকর ছবি দেখিতে দেখিতে এই ডাইরি লিখিতেছি। বদরী-বিশাল গমনের জন্য কয়েকজন পাঞ্জাবি রমণী আসিয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন। এখন বেলা প্রায় তিনটা, আমাদের নিম্নতলের আবাস-কক্ষের সোপান-গুলি গঙ্গা-বারিতে সিক্ত হইতেছে। ঠিক আমাদের সম্মুখে গঙ্গার পরপারে চণ্ডীমাতার পাহাড় দেখা যাইতেছে। আর আমাদের নয়নের পথে শুভ্র রজতরেখাময়ী কলনাদিনী জাহ্নবী কলকলতানে চঞ্চলচরণে প্রবহমানা। হরিদ্বারে গঙ্গার মনোমোহিনী ছবি দেখিলে হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এই স্থানে ক্ষণকাল বসিয়া ভাগীরথীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলে শোকতাপ বিদূরিত হয়। এমন নির্ম্মল বারিরাশি আর কোথাও নাই, এমন সুন্দর শোভা বুঝি আর কখনও দেখি নাই। ভগবানের কৃপায় আর একবার কিছুকাল পূর্ব্বে আমি পতিদেবতার সহ হরিদ্বার দর্শনে আসিয়াছিলাম। এ ছবি তখন মানসপটে অঙ্কিত করিতে পারি নাই। আজ ২৮শে চৈত্র।

আজ আমরা বৈকালে ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাদেবীর আরতি দর্শনে গমন করিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের তীর যেন স্বর্গধাম। এই স্থানে মহাযোগী শঙ্কর বহুকাল তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। প্রবাদ আছে, এই ব্রহ্মকুণ্ডে আজিও হরপেড়ি বা

হরের আসন বিদ্যমান আছে। কাল এই স্থানে সংক্রান্তির মহতী মেলা হইবে। প্রতি বৎসর মহাবিষুবসংক্রান্তিতে ব্রহ্মকুণ্ডে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। এই সংক্রান্তি মেলায় স্নান করিতে এখানে পাঞ্জাবি স্ত্রীপুরুষ দুই তিন হাজার আসিয়াছে। তা' ছাড়া সাধু সন্ন্যাসী ও জনমণ্ডলী স্রোতের ন্যায় পথে চলিতেছে। বেলা চারিটার সময় ব্রহ্মকুণ্ডের তটে সহস্র সহস্র নরনারী এই স্থানে সমবেত হইলেন। গঙ্গার তটোপরি স্থানে স্থানে সুবিস্তীর্ণ গালিচা বিছাইয়া দিল। তাহার উপর চৌকিপাতা, তাহার উপর সুন্দর আসনে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক সুন্দর-কান্তি দীর্ঘকায় পুরুষ আসিয়া উপবেশন করিলেন। সমস্ত পাঞ্জাবি নরনারীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বসিল। বেলা সাড়ে চারিটা হইতে তিনি হরিদ্বার ঋষিকুল স্কুল সম্বন্ধে একটী সুন্দর সারগ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার ভাষার উদ্দীপনায় ও ওজস্বিনী বক্তৃতায় সকলেই মোহিত হইলেন। অবশ্য বক্তৃতা হিন্দিতেই হইল, আমরা পার্শ্বে বসিয়া একাগ্রমনে শ্রবণ করিলাম। পাঞ্জাবি নরনারীগণ সকলেই সভাপতির কার্য্য সমর্থন করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই হরিদ্বার ঋষিকুলের সাহায্যার্থে সামর্থ্য অনুসারে সকলে কিছু কিছু অর্থ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্রহ্মকুণ্ডের তটে ৪।৫ স্থানে ঐ দিন ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা ও ধর্ম্মবিষয়ে গান হইয়াছিল। আমরা কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনিয়া সাধ্যমত কিছু দান করিয়া গঙ্গামায়ীর আরতি দর্শনে চলিলাম। ঘাটে এত জনতা যে ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য। একটু অগ্রসর হইয়াই একটী সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের

তটোপরি রাশি রাশি সদ্যঃবিকসিত গোলাপ ফুলের- ঝুড়ি বসান রহিয়াছে, দশ বার জন পুষ্পবিক্রেতা দোনা বাঁধিয়া ফুল সাজাইতেছে, প্রত্যেক যাত্রীই ফুল কিনিতেছে। একটী সুন্দর পাতার দোনা বাঁধিয়া তাহাতে চার পাঁচটী করিয়া সদ্যঃস্ফুট গোলাপ দিয়া তাহার সহ এক একটী ঘৃত দীপ দিয়া দুইটী করিয়া পয়সা পাইতেছে। আমরা প্রত্যেকেই এক একটী করিয়া ফুলের দোনা কিনিলাম। সেইগুলি নিকটে রাখিয়া সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া গঙ্গামায়ীর আরতি দর্শনে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে আসিলাম। তখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। সমস্ত পাঞ্জাবি, মারহাট্টি, বাঙ্গালী রমণীরা পুষ্পের দোনার উপর এক একটী ঘৃত দীপ জ্বালিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ফুলের দোনা দীপ বক্ষে করিয়া গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে চলিল। মনে হইল বুঝি আজ ভগীরথ-জননী ভাগীরথী মূর্ত্তিময়ী হইয়া পুষ্পদীপমালা গলদেশে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ক্রমেই গোধূলীর ললাটে দু'একটী করিয়া তারকা ফুটিয়া উঠিল। উপরে অনন্ত আকাশ আর নিম্নে সুরতরঙ্গিণী গঙ্গার রজতরেখার ন্যায় নির্ম্মল বারিরাশি। দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শত শত সাধু মহাত্মাগণ ব্রহ্মকুণ্ডের তটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গঙ্গাদেবীর আরতি আরম্ভ হইল, সাধুগণ শুভ্র চামর দ্বারা গঙ্গাদেবীকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। সুরসুন্দরী গঙ্গাদেবী পুষ্পাভরণা পার্ব্বতীর ন্যায় পুষ্পমালায় সুশোভিতা হইয়া যেন হাস্য করিতে লাগিলেন। আমরাও আরতি দেখিয়া

বাসায় ফিরিলাম। কিছু জলযোগ করিয়া রাত্রে শয়ন করিলাম। ২৯শে চৈত্র প্রাতে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া কুশাবর্ত্ত ঘাটে গিয়া পিতৃকার্য্য করিলাম। ঐ স্থানেই ব্রাহ্মণকে ভোজ্য উৎসর্গ করিলাম। আমার পিতার শেষ যাত্রার সময়ে তাঁহার চরণদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। আজ হরিদ্বারে কুশাবর্ত্ত ঘাটে নয়নের জলে পিতৃপিণ্ড দান সমাপ্ত করিলাম ও পিতার স্নেহময় মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শত শত নমস্কার করিলাম। পরে বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আমরা বেলা ২টার সময় পদব্রজে কনখল দেখিতে গেলাম। এখান হইতে কনখল বোধ হয় তুই মাইল পথ হইবে। আমরা গঙ্গার ধারে ধারে চলিলাম। দেড় ঘণ্টা পরে কনখলে আসিয়া পৌঁছিলাম। কনখল একটি পরম পবিত্র তীর্থ। এই স্থানে শুনিলাম দক্ষরাজকন্যা সতী পতিনিন্দা শ্রবণে যোগবলে জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখনও পাণ্ডারা দক্ষের যজ্ঞকুণ্ড বলিয়া কুণ্ড নির্দ্দেশ করে। এই স্থানে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। আমরা এই সমস্ত দর্শন করিয়া গঙ্গার নীলধারা দেখিতে গেলাম। কনখলের গঙ্গাটি যদিও স্বল্পপরিসর তথাপি তাহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যকুল আনন্দে খেলা করিতেছে। যাত্রীরা মৎস্যকুলের ক্রীড়া দেখিবার জন্য ময়দার-গুলি কিনিয়া জলে ফেলিয়া দিতেছে, আনন্দে মৎস্য-কুল লাফাইয়া লাফাইয়া ঐ ময়দার গুলি খাইতেছে। আমিও কিছু ময়দার গুলি কিনিয়া জলে ফেলিয়া দিলাম। ঝাঁকে

ঝাঁকে মৎস্য দলে দলে আসিয়া আহার করিতে লাগিল। বেলা অপরাহ্ণ দেখিয়া আমরা দেবমন্দিরে প্রণাম করিয়া আবার ধীরপদে গঙ্গার ধার দিয়া হরিদ্বারে ফিরিয়া আসিলাম। শীতল সান্ধ্যসমীরণে দেহ জুড়াইল। রাত্রে সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া দুই আনার লুচি ও মিষ্টি কিনিয়া খাইয়া শয়ন করিলাম।

৩০শে চৈত্র। আজ এখানকার লোকের পুণ্যতম মেষ-সংক্রান্তি। কিন্তু আমাদের সংক্রান্তি কাল। হরিদ্বারে এই সংক্রান্তি স্নানের জন্য বহুলোক আসিয়াছে। ভোর ৫টা হইতে স্নানের ঘাটগুলি—বিশেষতঃ ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাট লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। আমরাও পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর শীতলসলিলে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আজ কুশাবর্ত্ত ঘাটেও বহু জনতা। এখানে সকলেই পিতৃকার্য্য শ্রাদ্ধাদি করিতেছে। কাল আমাদের হৃষীকেশ যাইতে হইবে, এজন্য জিনিষপত্রগুলি আজ কিনিতে হইবে। প্রাতে স্নানপূজা সমাপন করিয়া সকলেই বাজারে চলিলাম। হরিদ্বারের বাজারটি নিতান্ত মন্দ নয়, এখানে ৮।১০ খানা গরম কাপড়ের দোকান, কম্বলের দোকান, ছাতা জুতা প্রভৃতির দোকান, মনিহারীর দোকান, ফল মূল মিষ্টান্নের দোকান আছে। আমরা গিয়া প্রথমে একটি গরম গেঞ্জি কিনিলাম। গেঞ্জির দাম ৩৲ টাকা লইল এবং ২॥০ টাকায় একটী ছাতা, দুই জোড়া দড়ির জুতা, ১টা কান ঢাকা টুপি, ১ জোড়া পায়ে বাঁধিবার পটি, একগাছা লাঠি ও ৩ ডজন বাতি দেশলাই প্রভৃতি বদরী-বিশাল গমনের প্রয়োজনীয় জিনিষ সব কিনিলাম।

ইহা ছাড়া মিছরি, ঈশগুল, মুগের ডাল, লবণ, হলুদের গুঁড়া, তেঁতুল, সুজি, চিনি প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে লইলাম। জিনিষপত্র কেনা হইলে বাসায় আসিয়া পাকাদি সমাপন করিলাম আর আমার পরিধেয় বস্ত্র ৪খানি গেরুয়া রঙ্গে ছোপাইয়া লইলাম। সমস্ত দিনটা বদরী-বিশাল গমনের সাজ-সজ্জা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে বেড়াইতে গেলাম। দেখিলাম পূর্ব্বদিনের ন্যায় জনতা-স্রোত আজিও চলিয়াছে। আজিও সেই পুষ্পদীপ-মালায় সুশোভিত হইয়া মা আমাদের যেন আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে পতিতপাবনী গঙ্গার আরতি দর্শন করনান্তে বারম্বার গঙ্গার চরণে প্রণাম করিয়া অন্ধকার হইতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম। ইতিমধ্যে গৌরবাবু ২খানা গাড়ি ও দুইজন বোঝাওয়ালা, ও তিনজন কাণ্ডিওয়ালাকে ঠিক করিয়াছিলেন। তাহারা সন্ধ্যার পর আসিলে ভোর ৬টার সময় হৃষীকেশে যাওয়া স্থির হইল। আমরা যে ভোলাশ্রমে ছিলাম তাহাতে বদরিকাযাত্রী আরও কয়েক জন পাঞ্জাবী রমণী ছিলেন। ভোরে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া, গায়ত্রী জপ করিয়া, শিবপূজা করিয়া আমরা যাত্রার উপযোগী বেশ করিলাম। গাড়ি আসিল, কাণ্ডিওয়ালারাও আসিল, সকলেই জয় বদরী-বিশালকি জয় বলিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গৌরবাবু টাঙ্গায় উঠিলেন। আমরা ছয়জন স্ত্রীলোক গাড়িতে বসিলাম। পাণ্ডা বিশ্বনাথ সুকুল গৌরবাবুর সঙ্গেই চলিলেন। হৃষীকেশ যাইতে আমাদের প্রত্যেকের ১॥০ টাকা করিয়া গাড়িভাড়া লাগিল।

বেলা ৯টার সময় গাড়ি সত্যনারায়ণ চটীতে আসিল। আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া সত্যনারায়ণ দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা দিয়া পুনরায় গাড়িতে উঠিলাম। সাড়ে দশটা কি এগারটার সময় কালীকমলী বাবার ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা ধর্ম্মশালায় নামিয়াই দ্বিতলের উপর একটি কুঠারী লইলাম। ঐ সময় হৃষীকেশস্থিত সাধু মহাত্মারা দলে দলে সদাব্রত লইতে আসিতেছেন। প্রায় দুই শত সাধু সন্ন্যাসী বৈরাগী আসিয়া কমলীবাবার ধর্ম্মশালায় সদাব্রত গ্রহণ করিলেন। ধন্য কালীকমলী-বাবার মাহাত্ম্য!

হৃষীকেশস্থিত সাধু মহাত্মাগণ বার মাস নিত্যই কমলীবাবার কৃপায় আহার প্রাপ্ত হইতেছেন। এই সদাব্রত দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা পাক দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাঁহারা এক এক বাটী ডাল ও ৮খানি করিয়া রুটি পান। আর যাঁহারা পাক দ্রব্য গ্রহণ না করিবেন তাঁহারা দেড়পোয়া আটা, ডাল, চাল, লবণ, ঘি পাইয়া থাকেন। বদরী-বিশাল গমনের জন্য যে সকল সাধু সন্ন্যাসীরা কমলীবাবার সদাব্রতে সাহায্য লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের এই স্থানে নাম লিখাইতে হয়। এই পথে যাইতে কমলীবাবার যতগুলি ধর্ম্মশালা আছে তথায় অবস্থান করিয়া সদাব্রত খাইতে খাইতে যাইতে পারেন। এই সর্ব্বত্যাগী কৌপীনধারী সাধুর অক্ষয়কীর্ত্তি জগতের বক্ষে চিরকাল জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। কমলী-বাবার ধর্ম্মশালার দ্বারে একস্থানে লেখা আছে যে বদরী-বিশাল-যাত্রীগণ কৃপা করিয়া আমার ধর্ম্মশালায় থাকিয়া আমায় কৃতার্থ

করিয়া যান এই প্রার্থনা। এমন আত্মত্যাগী মহাপ্রাণতার ছবি আর কোথাও আছে কি? কমলীবাবার ধর্ম্মশালাটি খুব বৃহৎ। বোধ হয় সহস্র ব্যক্তি থাকিতে পারে। দ্বারে একটি লেটার বাক্স আছে। দ্বারপার্শ্বে মুদিখানার দোকান আছে। কমলীবাবার নির্দ্দিষ্ট ভৃত্যগণ যাত্রীদের যত জলের প্রয়োজন হইতেছে সমস্ত জল তুলিয়া দিতেছে। রাত্রে যাত্রীদের প্রতি গৃহে গৃহে কমলী-বাবার ভৃত্যেরা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। শুনিলাম সাধু-সন্ন্যাসীদের উত্তরাখণ্ড যাইবার পাথেয় কম্বল আহার্য্য সবই এইস্থান হইতে দেওয়া হয়। কিছুদিন হইল কমলীবাবা দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার গদিতে তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য বসিয়াছেন। ইনিও সন্ন্যাসী, ইঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডল ও সৌম্যাকৃতি দর্শনে হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন, মায়ি তোমায় কি কিছু সাহায্য করিতে হইবে? আমি বলিলাম, "না বাবা তোমার চরণ দর্শন করিতেই আসিয়াছি। আমরা কাল প্রাতেই বদরী-বিশাল যাত্রা করিব।" হৃষীকেশে কমলীবাবার ধর্ম্মশালায় মোটঘাট রাখিয়া আমরা হৃষীকেশের ঘাটে স্নানার্থে গমন করিলাম। ধর্ম্মশালা হইতে গঙ্গার ঘাট বেশী দূর নয়। আমরা স্নানের জন্য ঘাটে নামিলে ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদের সংকল্পের মন্ত্র পাঠ করাইলেন, আমরা দু'টী করিয়া পয়সা দক্ষিণা দিলাম।

হৃষীকেশ স্থানটী অতি পবিত্র, শত শত সাধু মহাত্মার বাসস্থান। এখানে সুরসুন্দরী গঙ্গাদেবীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! মা আমার

যৌবনচাঞ্চল্যময়ী যুবতীর ন্যায় কল কল ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া যেন নৃত্য করিতেছেন। এই স্থানে গঙ্গা, ভাগীরথী ও চন্দ্রভাগা এই তিনের মিলনে ত্রিবেণী-সঙ্গম হইয়াছে। কি সুন্দর দৃশ্য! গঙ্গার ধারে ধারে কত সাধু মহাত্মারা বাস করিতেছেন। হরিদ্বারের ন্যায় এখানেও গঙ্গার তটের উপর চৌকি পাতা, তাহার উপর পাণ্ডারা বসিয়া আছেন ও যাত্রীদের মন্ত্রপাঠ করাইতেছেন। হৃষীকেশে নির্ম্মলসলিলা ভাগীরথীর পবিত্র বারিতে স্নান করিয়া ধন্য হইলাম। ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইয়া সুরধনীর তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস দর্শন করিলাম। পরে সাধুসন্ন্যাসীদের সাধ্যমত কিছু কিছু দান করিয়া ধন্য হইলাম। স্নানান্তে ঘাটের উপরে আসিয়া সম্মুখেই দেখি শ্রীরাম মন্দির। মন্দিরের ভিতর নবজলধর-শ্যামমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক হইল। পুষ্পধূপদীপের সুরভি গন্ধে মন্দির সুবাসিত। আমরা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বাসায় আসিয়া অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করিলাম এবং এই স্থানে দুইখানা পত্র লিখিয়া ডাকে দিলাম। আমার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল হৃষীকেশে দুই চার দিন থাকিয়া স্থানটা ভাল করিয়া দেখিব কিন্তু আমাদের সঙ্গী গৌরবাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা কাল এস্থান হইতে বিদায় লইতে হইবে জানিয়া আমরা প্রতাপসিং নামে একজন কাণ্ডি-ওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া হৃষীকেশ স্থানটীতে সাধুসন্ন্যাসীরা কতদূর পর্য্যন্ত থাকেন একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসিব, এই ভাবিয়া ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইলাম। খানিক দূর গিয়া লক্ষ্মণজীর

মন্দির দেখিলাম। বেশ সুন্দর সুদৃশ্য মন্দির। মন্দিরের ভিতরে রামচন্দ্রের ন্যায় নবদূর্ব্বাদল শ্যামমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন জুড়াইল।

তারপর সাধু মহাত্মাদের দর্শনের জন্য চলিলাম। এক মাইল গিয়া গঙ্গার তটের উপর রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দির মধ্যে সুন্দর লিঙ্গ-মূর্ত্তি। মন্দির দ্বারপ্রান্তে প্রৌঢ়বয়স্ক নগ্নদেহ একজন সাধু ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে বসিয়া আছেন। আমরা রুদ্রেশ্বরকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া সাধু মহাত্মার পদধূলি লইবার জন্য তাঁহার পদপ্রান্তে বসিলাম। তাঁহার শিশুর ন্যায় সরল শান্ত সহাস্য মুখমণ্ডল, কটীতে একগাছি রজ্জু বেষ্টিত, তাঁহাকে দেখিলেই হৃদয় ভক্তিতে আর্দ্র হয়। বাবা আমাদের নিকটে দেখিয়া বলিলেন, বোল গৌরীশঙ্কর সীতারাম জয় জয় রাধা শ্যাম। তিনবার মাত্র এই কথাটি বলিয়া একটু বিভূতি লইয়া আমাদের মাথায় দিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। আমাদের কাশীর এক সঙ্গিনী ঊষার মা তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা এখানে প্রণবানন্দ স্বামীর আশ্রম কোথা? আমাদের কৃপা করিয়া বলিয়া দাও।" বাবা হাসিমুখে বলিলেন, "মেরা সাথ আও মায়ী, হাম বাতলায় দেঙ্গা" বলিয়া শিশুর ন্যায় অকপট ভাবে নগ্নদেহে আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিলেন ও প্রণব-আশ্রম-প্রান্তে গিয়া আমাদের রাখিয়া আসিলেন। ইহাঁর নাম নাগা বাবা। ইনি রুদ্রেশ্বর মন্দির প্রান্তেই আশ্রমে বাস করেন। আমরা প্রণব-আশ্রম দেখিতে গেলাম। কাশীধামস্থ প্রণব স্বামী এই আশ্রমের

ভিত্তিস্থাপন করিয়া গত বৎসর এই স্থানেই দেহ রক্ষা করিয়াছেন। এই আশ্রম এখন পঞ্চবটী আশ্রম নামে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রণব স্বামী বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁর শিষ্য সেবানন্দস্বামী এক্ষণে এই আশ্রমের ভার লইয়াছেন। তাঁহাদের যত্নে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় আশ্রমটী প্রস্তুত হইয়াছে। তিনটি পাকা কুঠারি, সম্মুখে বারান্দা। প্রাঙ্গনের সম্মুখে একটী বড় কূপ বাঁধান আছে। গৃহের মধ্যে প্রণবস্বামীর বৃহৎ তৈলচিত্র ও তাঁহার গদী। শিষ্যেরা প্রত্যহ তাঁহার চরণপাদুকা পূজা করেন, দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। স্বামী সেবানন্দ আমাদের যত্ন করিয়া সমস্ত আশ্রমটী দেখাইলেন। আমরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম, কূপ হইতে সুশীতল বারি তুলিয়া আমাদের খাওয়াইলেন। আমরা কিয়ৎক্ষণ সেইখানে বসিয়া শ্রান্তিদূর করিয়া পঞ্চবটী হইতে বাহির হইলাম। দু একটী আশ্রম দেখিব ইচ্ছা করায় স্বামীজি বলিলেন, "মা', সাধুরা সকলে বাড়ীর মধ্যে থাকেন, এখান হইতে ২।৩ মাইল দূরে আছেন। এখন বেলা অধিক নাই আপনারা ততদূর যাইতে পারিবেন না। এই পঞ্চবটীর নিকট কয়েকটি আশ্রম দর্শন করুন।" আমরা তাঁহার কথামত পঞ্চবটীর নিকটে ২।৪ খানি আশ্রম দেখিয়া আসিলাম। মনে হইল এই জনমানব-শূন্য নিভৃত নির্জ্জন স্থান ভজনের জন্য কি সুন্দর। ইচ্ছা হয় জীবনের শেষ দিন কয়টী এইস্থানে কুটীর বাঁধিয়া ভগবানের চরণে পড়িয়া থাকি। সংসারের কোলাহলে মন যেন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম গুলির চতুর্দ্দিক কণ্টক বল্লিতে বেষ্টিত, সহজে কেহ প্রবেশ করিতে

পারে না। তাহার মধ্যে পরিচ্ছন্ন কুটীরে সাধুদের জীবন ধারণের উপযোগী মৃগচর্ম্ম কমণ্ডলু প্রভৃতি আছে।

স্বামী সেবানন্দ বলিলেন, মা! এইস্থানে অনেক মহাত্মা আছেন তাঁহাদের চিনিয়া লওয়াই ভার। ঘুরিতে ঘুরিতে অপরাহ্ণ হয় দেখিয়া কমলীবাবার ধর্ম্মশালার দিকে ফিরিলাম ও গঙ্গাতীরে গিয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিব ভাবিয়া গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সম্মুখে গঙ্গাতটোপরি দুইজন পাণ্ডা দাঁড়াইয়া গঙ্গাদেবীর আরতি করিতেছেন। একজন শঙ্খধ্বনি করিতেছেন আর দুইজন সাধু গঙ্গাদেবীর আরতির চামর লইয়া ব্যজন করিতেছেন। এখানেও হরিদ্বারের ন্যায় যাত্রীগণ সারি সারি দণ্ডায়মান হইয়া গঙ্গাদেবীর আরতি দর্শন করিতেছেন। কেহ কেহ বা ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গঙ্গার স্তব পাঠ করিতেছেন। যাত্রীগণ ঘৃতদীপ জ্বালিয়া গঙ্গার তটোপরি রাখিতেছেন। মা আমার পতিত-পাবনী। ধবল মুক্তাময়ী মালার ন্যায় তরঙ্গউচ্ছ্বাসে ছুটিতেছেন। আহা কি নির্ম্মল বারি রাশি। আমি সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এমন মধুর জল কখনও পান করি নাই। ক্রমে চারিদিক অন্ধকারাবৃত হওয়ায় আমরা ধর্ম্মশালা অভিমুখে চলিলাম। পথের ধারে দোকানে বড় বড় কলাইশুঁটি, একটা বাঁধাকপি ও একপোয়া দুধ ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া বাসায় আসিয়া আহারান্তে শয়ন করিলাম।

ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া দেখিলাম যে, গৌর বাবু আমাদের জন্য কাণ্ডি স্থির করিয়াছেন; আমি দুর্ব্বল অক্ষম বলিয়া তাঁহাকে

কাণ্ডি ভাড়া করিতে বলিয়াছিলাম। আমাদের ৩খানা কাণ্ডি ও ২টা বোঝাওয়ালা স্থির হইল। হৃষীকেশ হইতে এই কাণ্ডি-ওয়ালারা কেদার-বদরীনাথ দর্শন করাইয়া মেলচৌরি পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিবে এই করাড় হইল ও প্রত্যেক কাণ্ডিওয়ালা ৬৫৲ টাকা করিয়া ভাড়া পাইবে, এবং পাঁচ টাকা করিয়া বকসিস্ ও জলপানী পাইবে। ভোরে কাণ্ডিওয়ালারা কাণ্ডি লইয়া হাজির হইল। এই কাণ্ডিওয়ালারা সকলেই পাহাড়ী, ইহারা চৌহান রাজপুত। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ ও শান্ত স্বভাব, সরল ও বিশ্বাসী। ইহারা সকলেই গাড়ৃয়ালরাজ্যের অধিবাসী। আমার কাণ্ডিওয়ালার নাম গোলাপ সিং, বয়স ৪০।৪৫ হইবে, লোকটী ধর্ম্মভীরু। প্রথমে কাণ্ডিতে উঠিতে একটা ভয় হইয়াছিল। পরে দেখিলাম কাণ্ডি আরোহণ করিয়া বেশ আরামে যাওয়া যায়। পাহাড়িদের পৃষ্ঠে যেন এক একখানি ইজি চেয়ার বাঁধা, পা রাখিবার জন্য এক খানা করিয়া তক্তা বাঁধা আছে। তাহাতে কম্বল পাতিয়া বসিলাম।

আমাদের মত বৃদ্ধ লোকের কাণ্ডিতে যাওয়াই ভাল বোধ হইল। গৌরবাবু আমাদের গার্ড হইয়া আমাদের অগ্রে অগ্রে পদব্রজে চলিলেন। তাঁহার মাসী ও ভগ্নী পায়ে হাঁটিয়াই চলিলেন। আমি ও কাশীবাসিনী উষার মা ও গৌরবাবুর বৃদ্ধা মাসি তিনজনে কাণ্ডিতে চলিলাম। তবে প্রত্যহ আমি ৫।৬ মাইল হাঁটিতাম, নিতান্ত ক্লান্ত না হইলে কাণ্ডিতে চাপিতাম না। এখানে ঝাম্পান, ঘোড়া ও ডাণ্ডি প্রভৃতি সোয়ারিও পাওয়া যায়। ডাণ্ডির ভাড়া

তিন শত টাকা, সর্ব্বাপেক্ষা ডাণ্ডিতে যাওয়াই আরাম। ঝাম্পান চারিজন বাহকে লইয়া যায়, কিন্তু অত্যন্ত গা দোলে; সেও দুই শত টাকার কম নহে। কাণ্ডি ১০০৲ টাকার মধ্যে হয়। কিন্তু অধিক মোটা মানুষকে লইতে পারে না। যা হোক আমরা ভোরে মুখ হাত ধুইয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া কাণ্ডিতে উঠিলাম। "জয় বদরী-বিশাল" বলিয়া সকলেই হৃষীকেশ হইতে যাত্রা করিলেন। ক্রমে হৃষীকেশের হাট বাজার দোকান পোষ্টঅফিশ ছাড়াইয়া ১ মাইল আসিলাম। এইস্থানের নাম মুনিরেতি বা মুনির তপোবন। এইস্থানে যাত্রীদের সমস্ত মালামাল ওজন হইয়া মাসুল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এখানেও ঝাম্পান, ঘোড়া, কাণ্ডি সব পাওয়া যায়। এইস্থানে আমাদের মাল নামাইয়া সরকারী কর্ম্মচারীরা মাল ওজন করিয়া মাসুলের অগ্রিম কিছু টাকা লইয়া রসিদ দিলেন, কাণ্ডিওয়ালারাও কিছু কিছু অগ্রিম টাকা লইয়া রসিদ দিল। আমার লোটা, কম্বল ২ খানা, ব্যাগ, থালা, বাটী, কাপড়, সমস্ত ওজন হইল এবং আর আর সকলের মালও ওজন হইল। আমরা তখন মহা উৎসাহে বদরী-বিশালের পথে চলিলাম। হৃষীকেশ ছাড়াইয়াই দুই পার্শ্বেই পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হইল। তিন মাইল পরেই লছমন-ঝোলা। এই লছমন-ঝোলার নাম আমরা বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। সম্মুখেই গঙ্গার যে প্রকাণ্ড লৌহ সেতু দেখা যাইতেছে, ইহাই লছমন-ঝোলা নামে পরিচিত। অনেকেই বলেন লছমন-ঝোলা পার হইয়া তবে বদরী-বিশাল যাইতে হয়। লছমন-ঝোলা পারে এত ভয় কেন পূর্ব্বকালের

সেই কথাটা এক্ষণে বলিতেছি। শুনিলাম, আগে এই ঝোলা গঙ্গার দুইপারে দুইটা খোঁটায় মোটা দুগাছা দড়ি বাঁধা থাকিত এবং ঐ দড়ির মধ্যে মধ্যে মইয়ের মত বাশের ডাণ্ডা লাগান থাকিত; আবার মাথার উপরও দুইগাছা মোটা দড়ি বাঁধা থাকিত। যাত্রীরা ঐ দুইগাছা দড়ি ধরিয়া পার হইত। পার হইবার সময় দড়ির ঝোলা খুব দুলিত এবং পদতলের নিম্নে গভীর গর্জ্জনে গঙ্গা ছুটিতেছেন দেখিয়া ভয়ে যাত্রীগণের হৃৎকম্প হইত। এক্ষণে মাননীয় সুরযমল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার বদান্যতায় বহু অর্থব্যয়ে সরকার এই সুদৃঢ় লৌহ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

এই ঝোলা পার হইয়া আমরা বামণী বাবার স্বর্গদ্বারের ধর্ম্মশালায় পৌছিলাম। তখন বেলা ১১টা। ধর্ম্মশালাটি খুব উচ্চ পাহাড়ের উপর। আমরা মোট গাঠ্‌রি নামাইয়া স্বর্গদ্বারে স্নান করিতে গেলাম। একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করাইয়া আমাদের স্নান করিতে বলিলেন। এখানে গঙ্গা খুব গভীর পাহাড়ের নিম্নে ভৈরব কল্লোলে ছুটিতেছেন। আমরা স্বর্গদ্বারে স্নান পূজা সমাপন করিয়া অন্ন পাক করিয়া আহার করিলাম। পরে কিছুকাল বিশ্রাম অন্তে সকলেই লছমন-ঝোলা পার হইয়া উত্তরাভিমুখে চলিলাম। অপরাহ্নে ফুলবেড়িয়া চটীতে পৌছিলাম। যাঁহারা উত্তরাখণ্ডের সমস্ত তীর্থের সাফল্য লাভ করিতে চাহেন তাঁহারা গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী ও কেদার এবং বদরী এই প্রধান চারিটি তীর্থ-দর্শন করিয়া থাকেন। এই চারিটি স্থান দর্শন করিলে উত্তরাখণ্ডের সমস্ত তীর্থগুলি পথের মধ্যে পাইয়া থাকেন।

যাঁহারা সম্পূর্ণ উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করেন তাঁহারা হরিদ্বার হইতে রওয়ানা হইয়া অগ্রে গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী দর্শন করিয়া পরে কেদার-বদরী দর্শন করিয়া থাকেন। হরিদ্বার হইতে সকলকেই উত্তরাখণ্ড যাত্রা আরম্ভ করিতে হয়। গঙ্গোত্তরী যাইতে হইলে হরিদ্বার হইতে তিহিরী যাইতে হয়। হৃষীকেশ হইতে দেরাদূন কেহবা পদব্রজে কেহবা রেলপথে আসিয়া থাকেন। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ ১৪ মাইল পথ। এই ১৪ মাইল যাইতে ঘোড়াগাড়ি টোঙ্গাগাড়ি পাওয়া যায়। আবার হরিদ্বার হইতে ট্রেনে উঠিয়া হৃষীকেশ রোড পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

আমরা কাণ্ডিতে চড়িয়া যে চড়াই পার হইলাম তাহাই কত কষ্টকর মনে হইল ; যাঁহারা পায় হাঁটিয়া চড়াই পার হইলেন তাঁহারা বুঝিলেন চড়াই কি দুর্গম। বিজনীর চড়াই পার হইয়া কাণ্ডিওয়ালারা ঘর্ম্মাক্ত দেহে কুণ্ড চটিতে আসিয়া বিশ্রাম করিল। আমরাও ক্লান্ত হইয়া চটিতে বসিলাম। বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া স্নান আহারের চেষ্টায় গেলাম। কুণ্ড চটিটী ভাল, দুই চারিখানা দোকান আছে এখানে ঝরণার জল অতি সুমধুর। এইখানে স্নান পূজা সারিয়া পাকাদি করিলাম ও আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলা চারিচার সময় আবার সকলেই হাঁটিতে আরম্ভ দিলেন। তিন মাইল হাঁটিয়া আমারা বাঁন্দর চটী আসিলাম। তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে দেখিয়া এই স্থানেই আশ্রয় লইতে হইল। এই তিন মাইল পথ ক্রমাগত উতরাই এখানেও ২।৩ খানা দোকান আছে, চটীটি ছোট। রাত্রে হালুয়া রুটী করিয়া খাইলাম ও কম্বল

বিছাইয়া শয়ন করিলাম। আবার রাত্রি প্রভাত হইতেই যাত্রীদল "জয় বদরী-বিশাল" বলিয়া বাহির হইল। আমরাও মুখ হাত ধুইয়া ইষ্ট স্মরণ করিয়া বাহির হইলাম। তিন মাইল পথ আসিয়া মহাদেব চটী আসিলাম। এখানে মহাদেবের মন্দির আছে। গঙ্গাও নিকটে, একটী ধর্ম্মশালা ও দুইখানা দোকানও আছে। আমরা মহাদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। খানিক হাঁটিয়া আবার কাণ্ডিতে উঠিলাম। এখান হইতে ৭ মাইল গিয়া কাণ্ডিচটী আসিয়া পৌছিলাম। এখানে সুন্দর ঝরণার জল, অনেকগুলি দোকান আছে ও গাছপালাও দু-চারিটা আছে। স্থানটী ভাল। এখানকার চটীওয়ালাদের নিয়ম যে যাত্রীরা চটীতে চাউল ডাইল কাষ্ঠাদি লইলে তবে তাহাদের চটীতে থাকিতে স্থান দিবে, চটীর ভাড়া এক পয়সাও লইবে না—কিন্তু জিনিষপত্র না লইলে থাকিতে দিবে না। আমরা আজ এবেলা এখানে থাকিব স্থির করিলাম। স্নান পূজাদি করিয়া খুচুরী পাক করিয়া আহার করিলাম। রাস্তার মধ্যে মধ্যে পাহাড়ি বালক বালিকাদের সুন্দর মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। বৈকালে আবার হাঁটিতে লাগিলাম। কাণ্ডি চটীর পরে আরও দুই একটা চটি ছাড়াইয়া তিন মাইল উতরাই পথে ব্যাস গঙ্গার পুল পার হইয়া আমরা ব্যাসচটী আসিয়া পৌছিলাম। শুনিলাম এই স্থান হইতে ব্যাসগুহা চারি মাইল দূরে। এই স্থানটী ভগবান্ ব্যাসদেবের তপস্যার স্থান। ব্যাসচটীতে ৪।৫ খানা দোকান ও ধর্ম্মশালা আছে। চটীর নীচেই কলনাদিনী ভাগীরথী।

আমরা অন্য রাত্রে ব্যাসচটীতেই আশ্রয় লইলাম। সম্মুখেই ব্যাসদেবের মন্দির আছে, মন্দির মধ্যে ব্যসদেবের বিশাল মুর্ত্তি আছে। শুনিলাম এখান হইতে দেবপ্রয়াগ ৭ মাইল রাস্তা। ক্রমে সন্ধ্যা আগত দেখিয়া আমরা সন্ধ্যাপূজা সমাপনান্তে জলযোগ করিয়া আহার করিলাম। আবার ভোরে উঠিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সকলেই "জয় বদরী-বিশাল" বলিয়া চটী হইতে বাহির হইলাম। দেবপ্রয়াগ দর্শনের আনন্দে পথশ্রান্তি বোধ হইল না। তাহার পর ৫ মাইল হাঁটিয়া হৃষীকেশ সহর। হরিদ্বার হইতে ১ মাইল উত্তরে ভীমগোড়া। এইস্থানে ভীমেশ্বর মহাদেব আছেন। এই স্থানে ভীমকুণ্ডে স্নান করিয়া ভীমেশ্বরকে পূজা করিতে হয়। ইহার তিন মাইল পরে তুনি নামে একটী স্থান আছে, তাহা ছাড়াইয়া আর অর্দ্ধ মাইল গিয়া তুইটী পথ দেখা যায়; একটী দেরাতুন যাইবার রাস্তা, একটী হৃষীকেশ যাইবার রাস্তা। থুনবেড়ি চটীখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; বড় বড় লাল করবী ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া যেন চটীর সম্মুখটা আলো করিয়া আছে। চটীখানি দোতালা, পাহাড়ের নিম্নে, নিকটেই ঝরণা আছে। আমরা খানিক বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যা পূজা শেষ করিয়া খানকতক লুচি ও আলু ভাজিয়া খাইলাম। রাত্রে শয্যায় শয়ন করিলাম ও বদরী-বিশাল গমনের আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ভোর ৫টার পূর্ব্বেই কাণ্ডিওয়ালাদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মুখহাত ধুইয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। ৭ মাইল পথ হাঁটিয়া বেলা ১০টার সময় মোহন চটী

আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে ৩।৪ খানা দোকান আছে। সুমিষ্ট ঝরণার জল খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এই স্থানেই আজ আমাদের থাকা স্থির হইল। আমরা মোট গাঁটরি নামাইয়া স্নানাদি করিয়া আহারের যোগাড় করিতে লাগিলাম। আমাদের পাণ্ডা ঠাকুর আগে আসিয়া চটীতে জায়গা লইয়াছেন।

এই স্থানে পথের বামদিকে ধূসরবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী ও ঘনারণ্য। অপর দিকে কলনাদিনী নদী। আহারাদির পর আমরা চটীর চতুর্দ্দিকটা ঘুরিয়া আসিলাম। অপরাহ্ণ সময়ে ক্ষীণা কল্লোলিনীর তটে উপলখণ্ডে বসিয়া প্রকৃতির মনোহর শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। চারিদিকে ধূসর গিরিশ্রেণী ও ঘন অরণ্য, বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষীর কাকলী। আর আমাদের পদতলে ক্ষীণা নির্ঝরিণী ঝর ঝর রবে বহিয়া যাইতেছে। শীতল সন্ধ্যা সমীরণে পথশ্রান্ত শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপর সন্ধ্যা-বন্দনা করিলাম। পরে চটীতে আসিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়া দুধ দিয়া আহার করিয়া নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মনে হইল—

আছ অনলে অনিলে
চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গগনে
আছ বিটপীলতায় জলদের গায়
শশীতারকায় তপনে।

হরি, তুমি যে বিশ্বব্যাপী! বিশ্বের প্রতি বস্তুতেই তোমার

অনন্ত সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে। রাত্রে গৌরবাবু বলিলেন, "কাল আমাদের বিজণীর চড়াই ভাঙ্গিতে হবে। এ চড়াই বড় সোজা নহে।" ৭ মাইল চড়াই ভাঙ্গিতে হবে শুনিয়াই চক্ষুস্থির হইল। ভোরে উঠিয়া, হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, গমনোপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত হইলাম। বোঝাওয়ালাদের বোঝাগুলি দিয়া কাণ্ডিতে গিয়া উঠিলাম। পথের দুই পার্শ্বেই অচল গিরিশ্রেণী ও নিবিড় অরণ্য, তাহার মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ গিরিপথ! যেদিকেই চাই নীলমেঘের ন্যায় গিরিমালা দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে কল কলতানে ভাগীরথী ছুটিতেছেন। নিম্নে গভীর খাদ, একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। কোন স্থানে বা ঝঙ্কারকারিণী সুরধনী ঝঙ্কার করিতে করিতে, উপলখণ্ডের উপর দিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছেন। তখন ভোরের আলো একটু একটু উঁকি দিতেছে, দু একটা ক্ষীণতারকাও দেখা দিতেছে। সুখস্পর্শ শীতল মন্দ মন্দ প্রভাতবায়ু জীবদেহের সন্তাপ দূর করিতেছে। বিহগের মধুর কূজন শোনা যাইতেছে, বন্যপুষ্পের গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পূর্ণ হইতেছে। এইস্থানে মহাকবির সেই শ্লোক মনে হইল—

সেব্যমানঃ সুখস্পর্শৈ শালনির্য্যাসগন্ধিভিঃ।
পুষ্পরেণুকিরৎবাতৈ রাধুতঃ বনরাজিভিঃ॥

আমাদের বাম দিকে অত্যুচ্চ গিরিমালা, দক্ষিণে জাহ্নবীর উদ্দামতরঙ্গ উচ্ছ্বাস। কোথাও বা সুরধনীর চঞ্চলা বালিকামূর্ত্তি, কোথাও বা যৌবন চঞ্চলা যুবতীর ছবি। কোথাও প্রৌঢ়ার ন্যায় স্থির গম্ভীরমূর্ত্তি। আমরা ক্রমাগত চড়াই পথেই উঠিতেছি। দু-তিন

মাইল কাণ্ডিতে যাইয়া একবার শদব্রজে যাইব মনে করিলাম। কিন্তু চড়াইয়ে উঠিতে গেলে বুক দুরদুর করে, মনে হয় শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে; অগত্যা কাণ্ডিতেই চলিলাম; পথের মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গাত্রে যব গোধুম খুব জন্মিয়াছে দেখিলাম। চলিতে চলিতে মধ্যপথে আর দুই একটা চটী ছাড়াইয়া আসিয়া ক্রমে দেবপ্রয়াগের সন্নিকটে আসিলাম। পাণ্ডারা বলিল, দেবপ্রয়াগ সুপ্রসিদ্ধ স্থান। এইস্থানে ভাগীরথীর সহ অলকনন্দার সঙ্গম হইয়াছে। দেবপ্রয়াগ সহরটী পাহাড়ের উপর। দূর হইতে পাহাড়ের গাত্রে ঘরবাড়িগুলি যেন চিত্রিত ছবির ন্যায় দেখাইতেছে, দূর হইতে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন সবুজ রংঙ্গের বাড়ী ঘরগুলি পাহাড়ের গাত্রে স্তরে স্তরে আলেখ্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আমরা দেবপ্রয়াগে পৌছিবা মাত্র পাণ্ডারা আসিয়া খাতাপত্র আনিয়া আমাদের নামধাম চাহিল। দেবপ্রয়াগ নিবাসী পাণ্ডারা সব বদরীনারায়ণের পাণ্ডা। পাণ্ডারা আমাদের থাকিবার জন্য বাড়ীঘর দিল। আমার পাণ্ডা শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ লছমীনারায়ণ উপস্থিত না থাকায় তাঁহার দুই ভাই আমাদের বিশেষ খাতির যত্ন করিলেন। বেলা তখন সাড়ে ১১টা হইয়াছে দেখিয়া আমরা স্নান আহারের চেষ্টায় গেলাম। এখানে স্কুল ডাকঘর থানা সবই আছে। ২০।২২ খানা দোকান ও ধর্ম্মশালাও আছে। বেলা অনেক হইয়াছে, আমারাও ক্ষুধা পিপাসায় কাতর—এজন্য আমাদের আর সেদিন কোন কার্য্য হইল না। নিকটে ঝরণা ছিল তাহাতেই হাত মুখ ধুইয়া পূজাদি করিলাম। সেদিন

একাদশী ছিল, এজন্য কেহই অন্ন আহার করিল না। সকলেই পুরি মিষ্টান্ন কিনিয়া আহার করিল। আমিও তাহাই খাইলাম। আহারাদির পর মন্দাকিনীর সেতু পার হইয়া আমরা সহরটী দেখিতে গেলাম। সেতুর অপর পারেও অনেক দোকান, অনেক পাণ্ডার বাড়ীঘর আছে। দেখিলাম এই দেবপ্রয়াগেই সমস্ত পাণ্ডাদের বাসস্থান। এখানকার গঙ্গা অতি গভীর, পাহাড় হইতে ৫০০ ফুট নিম্নে কি তাহারও বেশী হইবে পড়িতেছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সহর বেড়াইয়া বাসায় আসিলাম। বাসাটী দ্বিতল, উপরে একটী কুঠারি সামনে বারান্দা। আমরা বারান্দায় শয়ন করিলাম। রাত্রে পাণ্ডারা আসিয়া কি চাই না চাই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন। ভোরে উঠিয়া শয্যাটী তুলিয়া দেখিলাম একটা বড় পাহাড়ী বিচ্ছু আমার শয্যার পার্শ্বে রহিয়াছে, ভগবানের কৃপায় আমি রক্ষা পাইয়াছি। পাণ্ডারা বলিল এ বিছা কামড়াইলে মানুষ মরিয়াও যায়। ইহার ভয়ানক তীব্র বিষ। বিছাটাকে তাহারা মারিয়া ফেলিল। প্রাতে আমরা অলকনন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমে স্নান করিতে গেলাম, পাণ্ডারা সঙ্গে গেলেন। আমাদের পাণ্ডা বিশ্বনাথ সুকুলও সঙ্গে চলিল। প্রায় দুই শত সিঁড়ি নামিয়া তবে গঙ্গাদেবীর দর্শন পাওয়া গেল।

দেখিলাম সঙ্গম ঘাটের কি সুন্দর দৃশ্য। তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথীর বক্ষে সুদূর বদরীনাথ হইতে অলকনন্দা উদ্দাম তরঙ্গে আস্ফালন করিতে করিতে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন। এমন প্রবল স্রোত যে কাহার সাধ্য স্নান করে। অলকনন্দার হিমশীতল জল। পাণ্ডাদের সাহায্যে একগাছা মোটা শিকল ধরিয়া সঙ্গমে অনেক কষ্টে

স্নান সমাপন করিলাম। একটু অসতর্ক হইলেই এই স্থানে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। স্নান করিয়া এই স্থানে ব্রাহ্মণকে ভোজ্য ও বস্ত্রাদি দান করিতে হয়। আমরা সাধ্যমত ভোজ্যাদি দান করিয়া এই স্থানে পিতৃকার্য্য করিলাম। পাণ্ডারা বলিল এলাহাবাদ প্রয়াগ অপেক্ষা এ প্রয়াগ অনেক শ্রেষ্ঠ। এখানে পিতৃকার্য্য করিলে বহু পুণ্য লাভ হয়। এই সমস্ত কার্য্যে প্রায় দুইঘণ্টা কাটিল, পরে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া ঘাটের উপর রঘুনাথজীর প্রাচীন মন্দিরটী দেখিতে গেলাম। দেবপ্রয়াগ অতি রমণীয় স্থান। এখানে বেশ শীত। সারিবদ্ধ দ্বিতল অট্টালিকাগুলি বেশ সুন্দর। রঘুনাথজীকে দর্শন করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। বাসায় আসিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইল।

ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদি দিয়া কিছু জলযোগ করিয়া পাকাদি করিয়া আহার করিলাম। এইদিন আমাদের দেবপ্রয়াগে থাকা হইল না। বৈকালে সকলেই দেবপ্রয়াগ ত্যাগ করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। ৬ মাইল হাঁটিয়া রাণীবাগ চটীতে পৌছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাত্রে এই চটীতেই থাকা স্থির হইল। রাণীবাগ চটীতে ২।৩ খানা দোকান ছিল ও সম্মুখে ঝরণাটী ভাল। দোকান হইতে আটা ঘি আলু কিনিয়া রুটী তরকারী তৈয়ার করিয়া খাইলাম। রাত্রে প্রগাঢ় নিদ্রা আসিল। যাঁহারা দ্বিতলে অট্টালিকার উপরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারেন না, তাঁহারা যদি প্রত্যহ ২।৪ মাইল পথ হাঁটিয়া দেখেন যে পথশ্রান্ত শরীরে কিরূপ সুনিদ্রা হয়। পরিশ্রান্ত শরীরের পক্ষে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা

ও ধূলিশয্যা সমান। কেননা শরীর ক্লান্ত হইলে ধূলার উপর কম্বল পাতিয়া নিদ্রা যাইতাম, তাহাতেও স্বর্গের ঘুম আসিত। মশারি বিছানার কোন প্রয়োজনই হইত না। আবার রাত্রি প্রভাত হইতেই গমন-উপযোগী বেশভূষা করিয়া শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ পূর্ব্বক চটীর বাহির হইলাম। আমার কাণ্ডিওয়ালা বড় ভাল লোক, তাহার সাহায্যেই আমি পাঁচ ছয় মাইল প্রত্যহ হাঁটিতাম। কিন্তু পূর্ব্বে আমার জীবনে কখনও দুই মাইল পথও হাঁটি নাই।

গোলাপ সিং সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিত, আমায় মাতার ন্যায় ভক্তি ও সেবা করিত। রাস্তায় পায়ের জুতা খুলিয়া গেলে জুতা পরাইয়া দিত। তৃষ্ণা হইলে জল আনিয়া দিত। চটীতে গিয়া আমার আহারের আয়োজন করিয়া দিত। আমাদের টাকা কড়িও রাখিত। বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় সকল কার্য্যই করিত। অসভ্য পাহাড়িরা আমাদের দেশের দাস দাসী অপেক্ষা অনেক ভাল, ইহারা সত্যপরায়ণ, মিথ্যা বলে না এবং বিশ্বস্ত। আমাদের সঙ্গে বদরীবিশাল যাত্রী অনেক চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে পাঞ্জাবি, মাড়োয়ারি ও সিন্ধীই বেশীর ভাগ। বাঙ্গালী যাত্রীসংখ্যা খুব কম। ইহাদের মধ্যে হিন্দুস্থানী অল্পবয়স্কা বধূগণ শিশুকে লইয়া অকাতরে এই দুর্গম রাস্তা চলিতেছে। কলিকাতা হইতে আমাদের একদল কুটুম্বিনী আসিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে দাস দাসী সরকার গোমস্তাও আছে। আর হাবড়া হইতে রামবাবু নামে একটী ভদ্রলোক আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও ভ্রাতৃবধূ আসিয়াছেন। বাকি সাধু সন্ন্যাসীর দল দলে দলে চলিয়াছে। রাস্তা ক্রমাগতই চড়াই চলিতেছি। চলিতে চলিতে পথিকদল যেমন

তৃষ্ণায় ব্যাকুল, অগ্নি শ্রীভগবান্ তৃষ্ণার্ত্ত পথিককুলের জন্য মধুর নির্ঝরের জলধারা অকাতরে ঢালিয়া দিতেছেন; এমন সুমধুর জলও কখন পান করি নাই। এই নীরস পাষাণের বক্ষ ভেদ করিয়া কোথা হইতে এই স্বাদু জলধারা পতিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া ভগবানের অপার করুণার কথা ভাবিয়া চক্ষু আনন্দ-অশ্রুতে পূর্ণ হয়। এই বিজন বনভূমিতে সহায়হীন মানব তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বতমালাময় স্থানে মরিয়া যাইত, কিন্তু কৃপাময় ভগবানের অপার করুণা! ভগবানের করুণাধারা বুঝি নির্ঝরের জলধারা রূপে পতিত হইয়া শ্রান্ত পথিক-কুলের জীবন রক্ষা করিতেছে। রাস্তায় দু এক মাইল পর পর নির্ঝরের জলধারা অবিশ্রান্ত ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন—রসোবৈসঃ—তিনি রসরূপী হইয়া জীবকুলকে রসদানে জীবিত রাখিয়াছেন, নতুবা জীবের জীবন রক্ষা হইত না। নির্ঝরের জল যেমন নির্ম্মল তেমনি সুমিষ্ট। এটী ভগবানের অযাচিত দান। পথশ্রান্ত পথিকগণের একমাত্র জীবন রক্ষা করিতেছে, নির্ঝরের জলধারা। এই গিরিমালাপূর্ণ স্থানে কোন খাদ্য বা ফল মূল কিছুই নাই। কেবল জীবনধারণের জন্য মধ্যে মধ্যে চটীতে চাল, ডাল, ঘি, আটা, লবণ আছে। আমরা এই সকল ভাবিতে ভাবিতে দু তিন খানা চটী ছাড়াইয়া রামপুর চটী আসিলাম ও বেলা অধিক দেখিয়া এই স্থানেই বসিলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া স্নান আহারের যোগাড় করিতে গেলাম। রামপুর চটী মন্দ নয়, এখানেও ৩।৪ খানা দোকান আছে। চাল, ডাল, ঘি, আটা, আলু সবই পাওয়া যায়।

এখান হইতে শুনিলাম ভিন্ন-কেদারেশ্বর ৫ মাইল। স্নানপূজা করিয়া আহারাদির পর আজ এই স্থানেই থাকিবার ব্যবস্থা হইল। মধ্যাহ্নসময়ে একদল পাহাড়ী একজন পাহাড়ী রমণীকে সাজাইয়া মাদল বাজাইয়া নাচিতেছে ও গাহিতেছে দেখিলাম। সময় কাটাইবার জন্য তাহাদের ডাকিলাম। পাহাড়ী পুরুষটী মাদল বাজাইতে লাগিল, পাহাড়ী রমণীটী কেদারনাথের স্তুতিগান করিয়া নাচিতে লাগিল। এ নৃত্যের মধ্যে কোন মন্দ ভাবভঙ্গী নাই, বেশ সরলভাবে পাহাড়ী রমণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল ও গাইতে লাগিল—

সুমিরণ কেদার নাথ
বাহু দরশন দিজে।
কৃপাকর দীন দয়াল
অধম পাতকী মুঝে।

এই চরণ গীতটি বারম্বার বলিয়া যাত্রীদের নিকট পয়সা আদায় করিতেছে। আমরা চারি আনা পয়সা দিয়া নর্ত্তকীকে বিদায় দিলাম। রাত্রে রামপুর চটীতেই থাকা গেল। ভোরে উঠিয়া নিত্যকর্ম্ম করিয়া রামপুর চটী হইতে সকলেই বাহির হইলাম। এখানকার রাস্তায় মধ্যে মধ্যে পাহাড়িদের সুন্দর ক্ষেত আছে। পাহাড়ী রমণীরা দলে দলে শস্য কর্ত্তন করিতেছে। রাস্তার দুইপার্শ্বেই সুপক্ব যব গোধুমে প্রাতঃসূর্য্যস্বর্ণাভ ছটা পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে। সুন্দরী পাহাড়ী রমণীরা সুগঠিত হস্তে পক্বশস্য কাটিয়া আটী বাঁধিতেছে, কেহ বা শস্যের বোঝা লইয়া গৃহে যাইতেছে। তাহাদের

ফুটন্ত গোলাপের মত নিটোল হাসিমাখা মুখগুলি কেমন সুন্দর! পাহাড়ি রমণীর পুরুষেরা ন্যায়ই পরিশ্রম করে। তাহাদের সন্তান সন্ততিগুলিও জননীর সহ যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছে। শিশুদের সরল মুখচ্ছবি দেখিলে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। ছোট ছোট বালক বালিকাগণ যাত্রীদের দেখিলেই পদ্মফুলের মত হাতগুলি পাতিয়া বলে "সুইবিভিনি দেও রাণী।" আমরা কতকগুলি করিয়া ছুঁচসূতা লইয়া গিয়াছিলাম, গৌর বাবু অনেক সূতার বাণ্ডিল সূঁচ ও টিপ লইয়া গিয়াছিলেন। পাহাড়ি রমণীদের ঐ সব দান করিলে তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। ক্রমে আমরা ভিন্ন-কেদারের নিকট আসিলাম। ভিন্ন-কেদারের মন্দিরটী পাহাড়ের উপরে, নিম্নে ভাগীরথী। এইখানে মন্দির সমীপে আমি কাণ্ডি হইতে নামিয়া জুতামোজা জামা কাপড় সমস্ত কাণ্ডিওয়ালার নিকট দিয়া গঙ্গাস্নান করিলাম ও স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিয়া এক কমণ্ডলু গঙ্গাজল লইয়া ভিন্ন-কেদারেশ্বরের পূজার্থে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরটী সুন্দর। দেখিলাম সম্মুখে শিবলিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেব রহিয়াছেন। তাঁহার দেহ রজত সর্পসূত্রে বেষ্টিত। মস্তকে রৌপ্যছত্র শোভা পাইতেছে। সেই স্থানে বসিয়া একাগ্রমনে দেবাদিদেবের পূজা স্তব করিলাম ও মনে মনে বলিলাম কেদার! যেন তোমার দর্শন লাভ করিতে পারি। আমি প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া কাপড় পরিয়া আমার কাণ্ডিতে উঠিলাম। গৌর বাবু ইতিপূর্ব্বেই ভিন্নকেদার দর্শন করিয়া অগ্রগামী হইয়াছেন। আমরাও শ্রীনগর অভিমুখে চলিলাম। এখান হইতে শ্রীনগর ৪ মাইল। রামপুর হইতে শ্রীনগরের রাস্তাটী ভাল। রাস্তাটী পাকা। রাস্তার

দুই পার্শ্বে বৃক্ষের সারি শ্রান্ত পথিককুলকে ছায়াদান করিতেছে। শ্রীনগর গাড়োয়ালের প্রধান সহর। এখানে কাছারি স্কুল ডাকঘর টেলিগ্রাফ আছে। আমরা নিকটে আসিলে ডাক্তারের চাপরাশী আসিয়া বলিল আপনাদের পায় কি বেদনা আছে, ঔষধপত্র কিছু চাই? আমরা বলিলাম কিছুই চাহি না, শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা ভালই আছি। ক্রমে শ্রীনগর সহরে প্রবেশ করিলাম, সহরটী সুন্দর, সহরের মধ্যে বড় বড় চওড়া রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তার দুইধারে সারি সারি দোকান। এথান হইতে প্রায় দুই মাইল হাঁটিয়া আমরা কমলীবাবার বৃহৎ ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌছিলাম। ইতিপূর্ব্বেই গৌর বাবু আমাদের জন্য ধর্ম্মশালার দ্বিতলের উপর কুঠারি স্থির করিয়া রেখেছিলেন। বেলা ১২টায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধর্ম্মশালায় আসিলাম। মোট গাঁটরি রাখিয়া কলের জলে হাত মুখ ধুইলাম। ধর্ম্মশালার প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে জলের কল ছিল। যাত্রীরা সকলেই স্নান করিতেছে। ধর্ম্মশালার পশ্চিম দিকে কমলীবাবার স্থাপিত কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। তাহার সংলগ্ন একটী উদ্যান আছে। এ ধর্ম্মশালা দুই খণ্ডে বিভক্ত, খুব বৃহৎ। এই ধর্ম্মশালাটী বদরিকা যাত্রীতে পূর্ণ। গৌরবাবু অনেক কষ্টে একটু রাঁধিবার স্থান পাইলেন। তাঁহারা পাঁচজনেই একত্রে আহার করিতেন। তাঁহাদের পাণ্ডার জুড়িদার পাক করিয়া দিত। আমি কিন্তু স্বহস্তে আমার অন্ন পাক করিতাম, আমার সঙ্গী সাথী কেহই ছিল না। একমাত্র ভগবান্‌ই সঙ্গী। পাণ্ডাঠাকুর অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমার পাকের জন্য একটু স্থান ঠিক করিলেন। তাহার পার্শ্বে

একজন মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসী পাক করিতেছিলেন, তিনি আমায় পার্শ্বের উনানটী দেখাইয়া দিলেন, আমিও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম আলুভাতে দিয়া দুটী অন্ন চড়াইয়া দিলাম। আমি তাঁহার আহারাদি হইয়া গেলে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট দুই চারিজন লোক আসিয়া বসিল। সন্ন্যাসী নিজ আসনে বসিয়া বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। পরিষ্কার হিন্দীতে বুঝাইলেন। আমি তখন বুঝিলাম সাধু সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইঁহার মধ্যে অসীম জ্ঞান লুক্কায়িত আছে। তখন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা আপনি কোথায় থাকেন। তিনি বলিলেন, মা আমি সন্ন্যাসী চিরদিনই যোশীমঠে থাকি, এইবার আমার আঠারবার বদরিকা আসা হইল। আমরা সন্ন্যাসীর নিকট কিছু শাস্ত্রোপদেশ শুনিয়া শ্রীনগরের বাজারহাট দেখিতে গেলাম। দেখিলাম অধিকাংশই গরমকাপড় কম্বলের দোকান। মুদিখানা ও মিষ্টান্নের দোকানও দু দশখানা আছে এবং তৈজসাদি থালাঘটির দোকানও আছে। আমরা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পরে সকলে একত্র হইয়া কমলেশ্বর মহাদেবের আরতি দেখিতে গেলাম। পুরোহিত তখনও উপস্থিত হয়েন নাই দেখিয়া মহাদেবকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম ও রাত্রে জলযোগ করিয়া নিদ্রাদেবীর স্মরণ লইলাম। আবার ভোরে উঠিয়াই মুখ হাত ধুইয়া সকলেই শ্রীনগর হইতে যাত্রা করিলেন। ৩ মাইল পরে সুক্তাচটী আসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া ভট্টসেরা চটী ছাড়াইয়া খাঁথরা চটি আসিলাম। খাঁথরা হইতে তিন মাইল শুধু

উৎরাই রাস্তা। পাহাড়ি রাস্তা ক্রমাগত চড়াই ও উৎরাই। রাস্তার কোন নির্ণয় নাই, কোন স্থানে পাহাড়ের নিম্ন দিয়া যাইতেছি, কোন স্থানে পর্ব্বতের শিখর দিয়াই রাস্তা। কোন স্থানে পর্ব্বতের গাত্র হইতে দুই তিন মাইল খাড়া পথ, কোন স্থানে পর্ব্বতগাত্রে ঢালু পথ, পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। ঐ দিন রাত্রে মেঘ বৃষ্টি হয়। বৈকালেই আকাশ অন্ধকার দেখিয়া আমরা খাঁখরা চটীতেই রহিলাম। এখানে দুইখানি দোকান, একটী ঝরণা আছে। প্রাতে বদরীবিশালকে স্মরণ করিয়া কাণ্ডিতে উঠিলাম। শুনিলাম এখান হইতে ৫ মাইল পরে গোলাপ চটী। গোলাপ চটি হইতে রুদ্রপ্রয়াগ দুই মাইল— বেলা নয়টার সময় গোলাপ চটী ছাড়াইয়া রুদ্রপ্রয়াগ আসিয়া পৌঁছিলাম। এই রুদ্রপ্রয়াগেই অলকানন্দার সহ মন্দাকিনীর সঙ্গম হইয়াছে। অলকানন্দা পুল পার হইয়া আধঘণ্টা পরে একটী চটীতে আসিলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া গোলাপ সিংহের তত্ত্বাবধানে ব্যাগ কাপড় চোপড় টাকাকড়ি রাখিয়া মন্দাকিনী সঙ্গমে স্নান করিতে গেলাম। বাসা হইতে সঙ্গম-ঘাট প্রায় দুই মাইল। অত্যুচ্চ পাহাড়ের বহু নিম্নে এই সঙ্গমঘাট। এখানে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু সার্থক হইল।

একদিকে হিমালয় শিখর হইতে কেদারনাথের পথ দিয়া স্বর্গ-গঙ্গা মন্দাকিনী ঝঙ্কার করিতে করিতে অদম্য উচ্ছ্বাসে প্রবলবেগে ছুটিয়া আসিতেছেন, আবার হিমাচল শিখরের অন্যপথ দিয়া বদরীনাথের রাস্তা দিয়া স্বর্গ গঙ্গা অলকনন্দা বিপুল তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া মন্দাকিনীর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন। দুইয়ের সঙ্গমস্থানে কি

বিপুল জলোচ্ছ্বাস! ধবল উর্ম্মিময়ী মালার ন্যায় শুভ্র ফেনপুঞ্জ বিস্তার করিয়া অলকানন্দা ও মন্দাকিনী পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে-ছেন। অলকানন্দার হিমশীতল নির্ম্মল জলরাশি আর মন্দাকিনীর তুষারগলিত জল—দুইয়ে মিলিত হইয়া কি শীতলই হইয়াছে! কি প্রবল তরঙ্গভঙ্গ! কি মন্দাকিনীর গভীর গর্জ্জন! আমরা অলকানন্দার পরপারে আসিয়া তটের উপরিভাগে একটি বাসা লইলাম। বাসাটি দ্বিতল সম্মুখে স্বচ্ছসলিলা অলকানন্দার নির্ম্মল বারিরাশি দেখা যাইতেছে। স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার পূত বারিরাশি যেন জীবকে পবিত্র করিবার জন্যই ধরাতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। পুণ্য সলিলা অলকানন্দা যেন আনন্দে উচ্ছ্বাসে গিরিপাদমূল ধৌত করিয়া কলতানে ছুটিতেছেন। আর গিরি শিখরের চতুর্দ্দিকে নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামল শৈলরাজি অদূরপ্রান্তে দেখা যাইতেছে। অলকানন্দার সেতুটি যেন অলকানন্দার বক্ষে মুক্তাহারের ন্যায় শোভা হইয়াছে। সেতুর উপর দাঁড়াইলে বোধ হয় যেন বায়ুতে সেতুটি দুলিতেছে। পর্ব্বত গাত্রে কত লতা গুল্ম নানা বৃক্ষ তরুলতা আঁকিয়া বাঁকিয়া পর্ব্বতের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া সুশোভিত হইয়াছে। বসন্ত আগমনে কত শত বনফুল ফুটিয়া সৌরভে দশর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছে। প্রাতঃকালের সুনীল আকাশে বালসূর্য্যের তরুণ কিরণ ছটা জগতে উদ্ভাসিত হইয়া হাস্যোজ্জ্বল ধরণীবক্ষে পতিত হইয়া কি রমণীয় শোভাই ধারণ করিতেছে। আমরা বাসায় উঠিয়া বিছানা পত্র মোট ঘাট রাখিয়া অলকানন্দা স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া পাণ্ডার সহ চলিলাম। দূর হইতে দেখিলাম কি মনোহর দৃশ্য! ধবল মুক্তাময়ী ভগীরথজননী ভাগীরথী কি বিপুল উচ্ছ্বাসে অলকানন্দার

কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইলাম। বোধ হইল জীবনে এমন দৃশ্য আর দেখি নাই। প্রকৃতির কি বিশ্ববিমোহিনী লীলা! এই সঙ্গমে স্নান করা বড় কষ্টকর। যদিও যাত্রীদের ধরিবার জন্য মোটামোটা লৌহ শিকল লৌহ খোঁটায় বাঁধা আছে, তথাপি সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাস মধ্যে নামিয়া স্নান করা দুঃসাধ্য। অনেক কষ্টে পাণ্ডার হাত ধরিয়া শিকল ধরিয়া সামান্য জলে মাথাটী ডুবাইলাম। একটু অসতর্ক হইলেই মন্দাকিনীর বিপুল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। কোন মতে স্নান করিয়া শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া পূজা আহ্নিক সমাপ্ত করিলাম। মনে হইল সমস্ত দিন এইখানে বসিয়া মন্দাকিনীর পুঞ্জীভূত ধবল ফেনরাশির উচ্ছ্বসিত শোভা দর্শন করি। শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া গঙ্গাদেবীর স্তবটী ভক্তিগদগদচিত্তে পাঠ করিলাম। যাঁহারা এস্থানে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম দেখেন নাই তাঁহারা গঙ্গার কি অপূর্ব্ব রূপ তাহা দেখেন নাই। পরে মন্দাকিনী ও অলকানন্দাকে প্রণাম করিয়া রুদ্রেশ্বর মহাদেবের পূজার্থে পাহাড়ের উচ্চমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। গোলাপ সিংই শুধু আমার সঙ্গী ছিল। গৌরবাবু ইহার পূর্ব্বেই রুদ্রপ্রয়াগ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মন্দির মধ্যে গিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে দেখিলাম দেবাদিদেবের সুন্দর লিঙ্গমূর্ত্তি। সম্মুখে ব্রাহ্মণ বসিয়া রুদ্রসূক্ত পাঠ করিতেছেন। আমি লিঙ্গমূর্ত্তির পার্শ্বে বসিয়া ভক্তি-অবনতচিত্তে পূজা করিয়া, প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দির দ্বারে আসিলাম। সম্মুখে কয়েকটী সাধু ছিলেন তাঁহাদের সাধ্যমত কিছু কিছু দিয়া গোলাপ সিংহের সঙ্গে

মন্দাকিনীর তীর দিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম। আমার সঙ্গী যাত্রীরা তখন কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, আমার একান্ত ভরসা সেই পরমাশ্রয় বিশ্বনাথ। তাঁহার ভরসায় আমি একাকী আত্মীয় স্বজন বিরহিত হইয়া এই দুর্গম রাস্তায় আসিয়াছি, ভরসা আছে দীনহীনকে তিনিই কৃপা করিবেন। নিতান্ত ইচ্ছা ছিল আমরা দুইজনে প্রভু বদরীনাথকে দর্শন করিব। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, শরীরও অপটু, এজন্য তাঁহাকে সঙ্গে আনিতে সাহস হয় নাই।

এই নিদারুণ হিমে শীতে অনাবৃত চটীতে রাত্রি যাপন করিলে তিনি নিশ্চয়ই পীড়িত হইতেন। আমাদের যাঁহারা সঙ্গী তাঁহারা জাতিতে তাম্বুলি। আমি ব্রাহ্মণ, অগত্যা আমার পাকশাক সমস্তই পৃথক্ হইত। আমি প্রত্যেক চটীতে গিয়া স্নান পূজান্তে স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতাম। আহারান্তে থালা ঘটি বাটী মাজিয়া লইতাম। কাশী হইতে আসিবার সময় মুগের ডাল, সুজি, চিনি, ঘৃত, মসলা ইত্যাদি যাহা লইয়া আসিয়াছিলাম তাহাতে অনেক সুবিধা হইয়াছিল। তবে চটীওয়ালাদের নিকট চাউল ডাইল কাষ্ঠ সমস্ত কিনিতাম। এখানকার চটীওয়ালারা বড় ভাল লোক, তাহারা যাত্রীদের পাক করিবার জন্য পিতলের হাড়ি, জল রাখিবার জন্য ঘড়া, রুটী করিবার জন্য কড়া চাটু সমস্ত দিয়া থাকে, যাত্রীর জন্য চটীগুলি লেপিয়া পুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। এই বিশাল গিরিসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যময় পথে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ও কাণ্ডিওয়ালা ভিন্ন আর কেহই সহায় নাই। যাত্রীরা আগুপাছু চলিয়া থাকেন, সব সময়ে একসঙ্গে চলিতে পারা যায় না। তবে শ্রীবদরীনাথের কৃপায় বদরী-

কেদারের একটী বই দুইটী রাস্তা নাই তাই রক্ষা। কেদারবদরী যাইবার একটী মাত্রই রাস্তা। এই রাস্তা ধরিয়াই ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে যাইতাম। ক্লান্তিবোধ হইলে পর্ব্বতগাত্রে পৃষ্ঠ হেলান দিয়া বসিতাম, পিপাসা হইলে করপুটে ঝরণার জল খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতাম। এত কষ্ট হইলেও মনের মধ্যে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিবার বিপুল আনন্দ বোধ হইত। প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে বড়ই আহ্লাদ হইত। কোথাও ঘন অরণ্য, কোথাও বন কুসুমের সুরভি গন্ধ, কোথাও বন বিহগের মধুর কাকলী, কোথাও নির্ঝরের ঝর্‌ঝর্ রব। সাধে কি আর সীতাদেবী সরমার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে কান্তারের অপূর্ব্ব শোভা বর্ণন করিয়াছিলেন। সেই কবির

হায় সখি কেমনে বর্ণিব সে কান্তার কান্তি আমি।

—কথাটা মনে পড়িল। যাঁহাদের দেশ ভ্রমণের সাধ বেশী তাঁহারা উত্তরাখণ্ডের পথে ভ্রমণ করিয়া যান। এমন প্রকৃতির মনোরম শোভা আর কোথাও নাই। ধূসর মেঘের ন্যায় পর্ব্বতমালার চতুর্দ্দিকে যে সকল উচ্চ পার্ব্বত্য পথে উঠিতে না পারিতাম, গোলাপ সিং পুত্রের ন্যায় হাত ধরিয়া তুলিত। পাহাড়িদের সাহায্য ব্যতীত এ সকল পথে কেহ আসিতে পারে না, কেননা বৃহৎ বৃহৎ বোঝা পাহাড়িরা পৃষ্ঠে করিয়া আনে। আমি গোলাপ সিংকে প্রত্যহ কিছু কিছু গুড় ছোলা খাইতে দিতাম, ইহাতেই তার খুব আনন্দ। আমি প্রত্যহ অর্দ্ধেক রাস্তা হাঁটিতাম। ইহাতে সে খুব খুসি থাকিত, বলিত

মাইজী ধর্ম্মাত্মা। ইহারা অশিক্ষিত পাহাড়ি লোক হইলেও সত্যবাদী, সরল ও বিশ্বাসী। ইহারা ধর্ম্মভীরু। কাহাকেও একটী উচ্চকথা কহে না, ইহাদের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নয়।

দেখিলাম পথের মধ্যে মধ্যে গ্রামগুলিতে পাহাড়ীদের পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন আবাস গৃহগুলি পাহাড়ের গাত্রে দেখা যাইতেছে। সকলেরই কতকগুলি করিয়া গো মহিষ ছাগল আছে। সকলেরই দশ পাঁচ বিঘা করিয়া জমিজারাত আছে এবং গো-মহিষ ছাগ সকলেই পালন করিতেছে। বোধ হয় এক এক জনের এক শত দেড় শত ছাগপাল আছে এবং চমরী গাইও আছে। উত্তরাখণ্ড যাইবার পথে সর্ব্ব-স্থানেই দেখিলাম পাহাড়ি পুরুষেরা হলচালনা করিতেছে এবং পাহাড়ী রমণীরা যব গোধূম প্রভৃতি শস্যকর্ত্তন করিতেছে। কেহ শস্য কাটিতেছে কেহ আঁটি বাঁধিতেছে। কেহ বা শস্যের বোঝা বহিয়া গৃহে লইয়া যাইতেছে। কেহ শস্য আছড়াইয়া পৃথক করিতেছে। ছোট ছোট বালক বালিকারাও পিতামাতার কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। কোন কোন স্থানে পাহাড়ি বালকগণ ছাগ মেষ গোচারণ করিতেছে। পাহাড়ি রমণীরাও গরু চরাইতেছে। উচ্চ পাহাড় হইতে ঘাস কাটিয়া আনিতেছে। ইহাদের চাষবাসের অবস্থা আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক ভাল। ইহারা সকলেই বলিষ্ঠ, শরীর খুব পরিশ্রমসহিষ্ণু। পাহাড়ি রমণীরা সুন্দরী ও সবল-শরীর। রমণীরা এক একটী লুঙ্গি বা ঘাঘড়ি পরা। এক একটী ঘাঘড়িতে ৫।৭ গজ কাপড় আছে।

গায়ে গরম কাপড়ের বড়ি আছে। ঘাঘড়ীর উপর এক একখানা ডোরাকাটা কম্বল বাঁধা। পাছে ঘাঘড়ী ময়লা হইয়া যায় এজন্য

উপরে কম্বল বেষ্টন করিয়া ইহারা গৃহকার্য্য করিয়া থাকে। রমণীদের ও পুরুষদের কোমরে এক এক খানা দা বা কাটারি বাঁধা আছে। পাহাড়ি রমণীরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধর গোলগাল গঠন, সকলেই শ্রম-পরায়ণা। বেশ সহাস্যমুখে নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে। ইহাদের ছেলেমেয়েগুলিও পাজামা, জামা, টুপি পরা। আমাদের দেশের ছোট লোকের পোষাক অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রধান কারণ ইহারা শীত-প্রধান দেশে বাস করে। এজন্য ইহাদের কাপড় জামা বেশী চাই। অনাবৃত দেহে এখানে এক মূহুর্ত্ত থাকা চলে না। দেখিলাম পাহাড়ি রমণীরা গৃহকার্য্য করিতেছে। উচ্চ পাহাড়ে উঠিয়া বড় বড় তাম্র কলস মস্তকে করিয়া ঝরণা হইতে জল আনিতেছে; স্বামী পুত্রের জন্য পাক করিতেছে, সন্তান পালন করিতেছে, আবার ক্ষেত্রে শস্য কর্ত্তন করিতেছে। আবার দেখিলাম অনেক রমণী কম্বল বুনিতেছে। আমাদের দেশের মেয়েরা কুড়ি বছরে দুই ছেলের মা হইয়া বুড়ি হইয়া বসেন, এখানকার পাহাড়ি মেয়েদের সুন্দর সবল শরীর, প্রফুল্ল মুখকান্তি ও পরিশ্রমের ঘটা দেখিলে লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিবেন না। পাহাড়ি নারীদের অলঙ্কারপ্রিয়তাও খুব। রমণীরা নাসিকায় বড় বড় ফাঁদিনথ পরিয়া কর্ণে নানাপ্রকার কর্ণাভরণ পরিয়া থাকে। কণ্ঠে কণ্ঠহার হাঁসুলি প্রভৃতি পরে, হস্তও নানারকম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। নানারঙ্গের বস্ত্র পরে; সপ্তমীর চাঁদের মত প্রশস্ত ললাটে সিন্দুর ফোটা ও টিকলি পরা। যাহা হ'ক পাহাড়ি রমণীদের আচার ব্যবহার দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। রাস্তায় দলে দলে তাহারা যাইতেছে, যাত্রী দেখিলেই, সু ইতাগা বিউনি দেও মায়ী, বলিয়া থাকে।

তাহার পর রুদ্রপ্রয়াগ ছাড়াইয়া ছাতৌনি চটী আসিলাম। এখান হইতে গঙ্গা একটু দূর ; সম্মুখে ২ খানা দোকান ও একটী ঝরণা আছে।

চটীর মাথা খানকতক গাছের ডালপালা লতাপাতা দিয়া ঢাকা। আর চটীর চতুর্দ্দিকই খোলা। অন্ধকার রাত্রিতে এই জনমানবহীন পর্ব্বতের মধ্যস্থলে যদি রাত্রে বাঘ ভল্লুক আসিয়া আমাদের প্রাণসংহার করে তাহা হইলে আর সংবাদ দিবার লোক থাকিবে না। কিন্তু করুণাময় ভগবানের কৃপায় আমাদের পায়ে একটি কাঁটাও ফুটে নাই। তিনিই আমাদের এই জনহীন প্রান্তরে একমাত্র সাথী।

আহারাদি করিয়া ছাতৌনি চটী ছাড়িয়া দুই মাইলের পরে মঠ চটী আসিলাম। এই স্থানেই আজ থাকা হইবে। গৌরবাবু ও তাঁহার ভগ্নী যদিও পদব্রজে গমন করিতেছেন তথাপি তিনি বলিষ্ঠ দেহ, সবল শরীর ; আমাদের বহু পূর্ব্বে তিনি চটীতে আসিয়া আমাদের জন্য স্থান রাখিতেন। নতুবা যাত্রীর ভিড়ে চটিতে স্থান পাওয়া দুর্ঘট। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার চতুর্দ্দিক্ বেড়াইলাম। যে দিকে চাই ধূম্রবর্ণ শৈলমালা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। এখানে ৩।৪ খানা দোকানও আছে। ঝরণার জলটীও মধুর। সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া হালুয়া রুটী খাইয়া শয়ন করিলাম। শয়নমাত্রেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম। স্থান কাল তখন আর কিছুই মনে রহিল না। ভোর ৪॥০ সময় কাণ্ডিওয়ালা আসিয়া ডাকিল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া কাপড় পরিয়া রওয়ানা হইলাম কিন্তু দুই পা যাইতে না যাইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল। পাহাড় হইতে

বৃষ্টির জলধারা ঝনঝন শব্দে নামিতে লাগিল। উৎসগুলি হইতে প্রবল বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। এস্থানে লোকালয় নাই। বিজন বনপথ—'মধুসূদন রক্ষাকর' বলিয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিলাম। বিপদভঞ্জন হরিকেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পর্ব্বতগাত্রস্থিত বৃক্ষ সকল ঝড়ের বেগে মড় মড় শব্দে দুলিতে লাগিল। প্রকৃতির তাণ্ডব মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলাম কিন্তু প্রভুভক্ত পাহাড়ীরা এই ঝড় বৃষ্টিতে আমাকে স্কন্ধে করিয়া ছুটিতে লাগিল। একঘণ্টা ছুটিয়া তাহারা একটী ছোট চটীর মধ্যে আমাদের পৌছাইয়া দিল। রাত্রে ঝড়বৃষ্টি মেঘ দুর্য্যোগে এই চটীতেই কাটাইতে হইল। বৃষ্টির জলের ঝাপটায় সমস্ত ভিজিয়া গেল। চটীওয়ালার কাছে এক আনার কাঠ কিনিয়া তাই অনেক কষ্টে জ্বালিয়া হাত পা গুলা একটু গরম করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। আমাদের মত সকল যাত্রীই এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ, রাত্রে এই চটীতেই বাস করিলেন। চটীর তিন দিক্ খোলা! মাথায় আচ্ছাদন মাত্র আছে।

মঠ চটী হইতে রামপুর চটী নয় মাইল। আমরা এইস্থানে আহার আদি বেলা এগারটার মধ্যে সমাপ্ত করিলাম। আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দেখিতে দেখিতে এক পশলা বৃষ্টি আসিল। আমরা তাড়াতাড়ি বৃষ্টি ছাড়িলেই বাহির হইলাম, কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতেই খুব শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, চারিদিক্ অন্ধকার। হঠাৎ এত ঝড় উঠিল যে আমার ছাতাটী ভাঙ্গিয়া গেল। এই পার্ব্বত্য রাস্তার মধ্যে মহাবিপদে পড়িলাম। আবার শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে সেই চটী তিন মাইল দূরে। আমরা কম্বল মুড়ি দিয়া

ছুটিতেছি গোলাপ সিং বলিল মাইজী বহুত পাথর গিরেগা। আমি বলিলাম নিকটে যদি পর্ব্বতের গুহা থাকে শীঘ্র চল নতুবা শিলা-বৃষ্টিতে রাস্তায় মরিতে হইবে। খানিকটা পথ দৌড়িয়া একটী পর্ব্বতের গুহার মধ্যে আসিয়া প্রাণ রক্ষা করিলাম। বোধ হয় ভগবান্ কৃপা করিয়া নিরাশ্রয় পথিকগণের জন্য পাহাড়ের মধ্যে এইরূপ গুহা করিয়া রাখিয়াছেন। গুহাটী ছোট—মাথার উপর পাহাড়টী যেন ছত্র ধরিয়া আছে। আমাদের ৩ জন কাণ্ডিওয়ালা, বোঝাওয়ালা আমরা ৩ জন স্ত্রীলোক—এই গুহামধ্যে আশ্রয় লইয়া বসিয়া রহিলাম। তখন বেলা প্রায় ২টা বাজিয়াছে একঘণ্টা বৃষ্টি হইয়া গেল তথাপি মেঘ কাটিল না। গোরবাবু ইতিপূর্ব্বেই আমাদের অগ্রগামী হইয়াছেন। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্‌সন করিয়া বাতাস বহিতেছে। আমরা ভাবিলাম সন্ধ্যা হইলে এই বনের মধ্যে বাঘভালুক আসিবে। অগত্যা বৃষ্টির বেগ থামিলে পথে বাহির হইলাম—কোন প্রকারে চটীতে পৌঁছাইতেই হইবে।

দুই তিন মাইল আসিলে মেঘ করিয়া বৃষ্টি আসিল। অগত্যা নিকটে একটী চটীতেই রহিলাম। ক্রমে বৃষ্টি খুব আরম্ভ হইল। এখানে দুইখানা দোকান ছিল, দূরে একটী ঝরণা ছিল। গোলাপ সিং জল আনিয়া দিলে পূজা পাঠ করিয়া খেচরান্ন পাক করিয়া আহার করা গেল। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিল। এ চটীটী থাকিবার মত নহে দেখিয়া আহারাদি করিয়া গোরবাবু আগেই বাহির হইলেন। আমরাও পশ্চাৎ চলিলাম। আধ মাইল যাইতে না যাইতেই বড় বড় শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেশ ঝড় উঠিল। চটী তখন দুই মাইল দূরে।

পথে কোথাও আশ্রয় স্থানও নাই। আমি কাণ্ডি হইতে নামিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া ছুটিলাম, আমার সঙ্গিনীও আমার অনুসরণ করিলেন। মনে হইল বুঝি বা পাহাড় হইতে ঝড়ে উড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। হাওয়ার কি জোর! গোলাপসিং বলিল মাই পাথর যব বহুত গিরেগা ত রাস্তা মে মথোগে। আমি মনে মনে ইষ্টজপ করিতে করিতে বলিলাম 'নিকটে পাহাড়ের গুহা আছে শীঘ্র চল'। খানিকটা দৌড়িয়া আসিয়া একটি ছোট গুহা পাইলাম। কোন ক্রমে মাথাটা তাহাতে বাঁচিল। খানিকটা শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল।

একটু পরিষ্কার হইল দেখিয়া আবার হাঁটিতে লাগিলাম। চটীতে যে প্রকারে হয় পৌঁছাইতেই হইবে। এ সব অরণ্য পথে রাত্রি হইলে হিংস্রক জন্তুও বাহির হইতে পারে। গোলাপ সিং বলিল 'মাই শীঘ্র কাণ্ডিমে উঠ, জোর বুন্দি আবে গা'। আমরা কাণ্ডিতে উঠিলাম। কিছুদূর গিয়াই সনসন করিয়া বৃষ্টি আসিল। ক্রমে বৃষ্টির বেগ প্রবল হইল। পাহাড় হইতে বৃষ্টির জল কল কল শব্দে নামিতে লাগিল। উৎস হইতে বিষম বেগে জলধারা পড়িতে লাগিল। এ স্থানে পার্ব্বত্য পথ, লোকালয় নাই। বিজন অরণ্য ভূমি। একাগ্রমনে 'মধুসূদন, রক্ষা কর' বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। পর্ব্বতস্থিত বৃক্ষ সকল ঝড়ে আন্দোলিত হইয়া মড় মড় শব্দ করিতে লাগিল। প্রকৃতির তাণ্ডবমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলাম। এই বৃষ্টি মাথায় করিয়া কাণ্ডিওয়ালারা আমাদের মাথায় লইয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে একটা চটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। চটীটী ছোট, বৃষ্টির জন্য আমাদের মত অনেক যাত্রীই এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

সমস্ত দিনটা মেঘ বৃষ্টিতে কাটিল। সন্ধ্যার সময় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। খানকত রুটি করিয়া খাইয়া উনানের পার্শ্বে কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি ঝড় বৃষ্টি চলিল, জলের ঝাপটায় চটী ভাসিয়া গেল। চটীর তিন দিক্‌টা খোলা। মাথাটা শুধু রক্ষা করিতেছে। এইরূপে অনিদ্রায় রাত্রি কাটিল। আমাদের মত অনেক যাত্রীই এইরূপে কাপড় চোপড় ভিজিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল ভগবান্ সাধনার বস্তু এমন কি সাধনা করিয়াছি যে সুলভেই তাঁহার দর্শন পাইব। শুনিয়াছি বিনা তপস্যায় ভগবানের কেহ দর্শন লাভ করিতে পারে না। বোধ হয় তাই সুদূর হিমালয়ে তিনি বাস করিয়া যাত্রীদের পথে তপস্যার ক্লেশ দিয়া বিশুদ্ধ করিয়া তবে দর্শন দান করিবেন। বদরিকা-যাত্রীগণ এই সুদীর্ঘ পথে সংযম অভ্যাস করিয়া তাঁহার নাম জপ করিয়া দিনান্তে হবিষ্যান্ন করিয়া কম্বলাসনে শয়ন করিয়া সত্যনিষ্ঠ হইয়া চলিলে তবে শ্রীভগবান্ তাহাদের মনের মলিনতা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া থাকেন। আজ এই কথাটি বার বার মনে হইল যে বিনা সাধনে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না। নতুবা প্রভু! জগতের সমস্ত রাজ্য ছাড়িয়া তুমি চিরহিমানীমণ্ডিত হিমালয় শিখরে অবস্থান করিবে কেন? এ স্থানে মানবের কোলাহল নাই, দ্বন্দ্ব নাই, দ্বেষ নাই—নির্জ্জন বাস করিতেছ। তুমি আমাদের আকর্ষণ করিয়া না আনিলে আমাদের কি শক্তি ছিল যে লক্ষ লক্ষ গিরিমালা অতিক্রম করিয়া তোমার দর্শনে আসিব। তুমি যে ঠাকুর ভক্তবৎসল, চিরদিনই ভক্তকে পোষণ করিয়া থাক। সেই তপস্যায় আজ

তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। দেখিলাম ক্রমে নিশা অবসান হইল।

ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার, প্রভাত অরুণের রক্তিম-রাগ পূর্ব্ব গগনে দেখা দিতেছে। প্রাতে উঠিয়াই বিছানাপত্র বাঁধিয়া সকলেই অদম্য উৎসাহে হাঁটিতে লাগিলাম। পথে বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল। প্রভাত সূর্য্যকিরণে জগৎ হাসিয়া উঠিল। বন কুসুমের গন্ধে দশদিক্ ভরিয়া গেল। বৃক্ষশাখাস্থিত পাহাড়ি বুলবুলের গান শুনিতে শুনিতে আনন্দে চলিলাম। তাহার সহ নির্ঝরের কলতান মিশিয়া কর্ণবিবরে যেন অমৃতধারা ঢালিতেছিল। এক মাইল আসিয়া আমরা ছোট নারায়ণের মন্দির দেখিলাম। এখানে মন্দির মধ্যে নারায়ণের সুন্দর মূর্ত্তি আছে। তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিয়া আমরা সাড়ে তিন মাইল পথ চন্দ্রাচটী আসিলাম। এখানে চন্দ্রশেখর মহাদেব ও দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডা বলিল এই স্থানে ক্ষুদ্র চন্দ্রানদীর সহ মন্দাকিনীর সঙ্গম হইয়াছে। কাঠের পুলের উপর দিয়া নদী পার হইলাম। নদী পার হইতে প্রত্যেক কাণ্ডি-ওয়ালার দুই আনা করিয়া মাসুল লাগিল। মানুষের মাসুলও দুই পয়সা করিয়া দিতে হইল। এই চন্দ্রাচটীতে মোটঘাট রাখিয়া চন্দ্রা ও মন্দাকিনী সঙ্গমে স্নান করিয়া পূজাদি করিলাম। এখানে ২।৩ খানি দোকান আছে। নিকটে জলের ঝরণা আছে। পরে পাকাদি করিয়া আহার করিলাম। আহারের পর বেলা ৩টার সময় আবার তল্পি বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। ১ মাইল আসিয়া ভীরিচটি। এখানে মন্দাকিনীর লৌহসেতু আছে। সেতুর নিম্নে ভৈরবগর্জ্জনে

মন্দাকিনী ছুটিতেছেন। এখানে ৩।৪ খানি দোকান আছে। সম্মুখে ঝরণার জল অবিশ্রান্ত পড়িতেছে। রাত্রে এই স্থানেই বিশ্রাম হইল। আবার প্রাতে উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া জয় বদরীবিশাল বলিয়া চটী হইতে বাহির হইলাম। তিন মাইল আসিয়া কুণ্ডচটী পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে তিন মাইল চড়াই উঠিয়া তবে গুপ্তকাশী যাইতে হইবে। আমাদের পাণ্ডা গৌরবাবু আজ এই চটীতেই রাত্রি বাস করিবেন স্থির করিলেন। প্রাতে আমরা গুপ্তকাশী দর্শন করিব স্থির হইল। সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম। চটীতে পাহাড়ি মাছির উপদ্রবটা বড় বেশী। প্রাতে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করিব—এই আনন্দে রাত্রি কাটাইলাম। ভোরে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। আমার শরীর দুর্ব্বল, তাহার উপর হৃৎপিণ্ডও দুর্ব্বল—চড়াই উঠিতে অত্যন্ত হাঁপ ধরে। অগত্যা কাণ্ডিতেই উঠিলাম। দূর হইতে গুপ্তকাশী দেখা যাইতেছিল, পাহাড়ের ছোট ছোট বাড়ীগুলি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আমরা গুপ্তকাশী আসিয়া কমলী বাবার ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম। এই ধর্ম্মশালায় উত্তরাখণ্ডের যাত্রী অনেকেই আসিয়াছেন। গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী যাইবারও অনেক যাত্রী আছেন। গুপ্তকাশী স্থানটী সুন্দর—পাহাড়ের উপর ছোট গ্রামখানি পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন। ৮।১০ খানা দোকান আছে। ডাকঘর আছে। ধর্ম্মশালার পার্শ্বেই বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার মন্দির। মন্দিরের মধ্যে বিশ্বনাথ রহিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে অন্নপূর্ণার মন্দির। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে একটী বড় কুণ্ড আছে। দুইদিক হইতে দুইটী ধারা আসিয়া কুণ্ড মধ্যে পতিত হইতেছে।

বৃহৎ দেবালয়, তাহার চারিদিকে প্রশস্ত অঙ্গন। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে গুপ্ত দান করিতে হয়। আমরা ধর্ম্মশালায় মোটঘাট রাখিয়া এই কুণ্ডে স্নান করিলাম। ব্রাহ্মণ সংকল্প মন্ত্র পাঠ করিলেন। স্নানান্তে বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়া তাঁহার পূজা করিলাম। ভগবান্ বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া মন আনন্দে অভিভূত হইল। পরে অন্নপূর্ণা মাতাকে দর্শন করিয়া পূজা করিয়া ধন্য হইলাম। এখানে দানের মাহাত্ম্য খুব বেশী। আমরা অবস্থা অনুযায়ী ব্রাহ্মণকে যথাসাধ্য অন্নবস্ত্র ভোজ্যপাত্র সহ দান করিলাম। এখানে নারিকেলের মধ্যে যাহার যেমন ইচ্ছা তাহা দিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে গুপ্তদান করিতে হয়। আমরাও গুপ্তদান করিলাম। এই দানের দ্রব্যগুলি ও ভোজ্য ৺কেদারের পাণ্ডা লইলেন। গৌরবাবু এই স্থানে কুড়ি টাকা মূল্যে সবৎসা গাভী কিনিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। কাশীর উষার মা একটী গাভী ২০ টাকায় কিনিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

আমরা স্নানপূজা দর্শনাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় গুপ্ত কাশীতে প্রভু বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণামাতার আরতি দর্শন করিলাম এবং মন্দিরে দীপ-দান করিয়া বাসায় আসিয়া জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম। শয়নেও তাঁহারই চিন্তা করিতাম। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম গুপ্তকাশীর দক্ষিণভাগে মন্দাকিনী পার হইয়া ঊখীমঠ আছে। রাত্রিশেষে নিদ্রা ভঙ্গে নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কাপড় চোপড় পরিয়া জয় বদরীবিশাল বলিয়া সকলেই গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। এখানে বড় ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। শীতও খুব। অগত্যা গরম কাপড় ও জুতা মোজা আঁটিয়া চলিতে লাগিলাম। গুপ্তকাশীর এক

মাইল দূরে নালাচটী নামে চটী আছে। এই নালাচটী হইতে দুইটি রাস্তা দুই দিকে গিয়াছে। কেদারনাথ দর্শন করিয়া এই নাল'চটীতে সকলকেই আসিতে হইবে। একটী রাস্তা কেদারনাথের পথে গিয়াছে, অন্য রাস্তাটী ওখীমঠ পার হইয়া বদরীনারায়ণের পথে গিয়াছে। নালাচটী পার হইয়া কিছু দূর আসিয়া আমরা মোতা-দেবীর মন্দিরে আসিলাম ও দেবীকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা নারায়ণকোটী চটীতে আসিয়া পৌছিলাম। তখন বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সকলেই এই চটীতেই থাকা স্থির করিলেন। এই স্থানে মন্দিরের মধ্যে নারায়ণের মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানে দুই তিনখানি দোকান ও একটী ঝরণা আছে। আমরা স্নানাদি করিয়া নিত্যপূজা সমাপন করিয়া মন্দির মধ্যে গিয়া নারায়ণকে দর্শন করিলাম। পরে পাকাদি করিয়া আহার করা গেল। তারপর ২ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া বেবেঙ্গ্ চটী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই চটীর নীচে একটী নদী আছে। এই স্থান হইতেই কেদার যাত্রার চড়াই আরম্ভ।

রাত্রে এই চটীতেই থাকার ব্যবস্থা হইল। গোলাপসিং বলিল মাইজী আগাড়ী ভারি চড়াই মিলেগী। সে আমায় পাক করিবার জন্য কিছু কাষ্ঠ জল আনিয়া দিল। আমি রুটী প্রস্তুত করিয়া আহার করিলাম। আহারান্তে শ্রীভগবানের নাম করিয়া শয়ন করিলাম। ভোরে উঠিয়া আবার হাঁটিতে লাগিলাম। কেদারনাথের পাণ্ডার পুত্র বিশ্বনাথ স্বকুল আমাদের সঙ্গে বরাবর কেদার পর্য্যন্ত চলিতেছেন। ইহাঁর বয়স অল্প হইলেও খুব বিনীতও মিষ্টভাষী;

তিনি সর্ব্বদা আমাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। পাণ্ডার জুড়িদারও আমাদের হাট বাজার করিয়া দিত। তাহার নাম ছিল দুর্গাপ্রসাদ।

চারি মাইল আসিয়া আমরা দোলনাচটী আসিলাম। এখানে মহিষ-মর্দ্দিনীর সুন্দর মন্দির আছে ও মন্দির অভ্যন্তরে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি আছে। আমরা মাকে দর্শন করিয়া পাণ্ডাকে এক আনা দক্ষিণা দিলাম। আজ ১৬ই বৈশাখ—পাণ্ডা বলিতেছেন ২২শে শ্রীকেদার প্রভুর পাট খুলিবে। সেই দিনই আমরা কেদারনাথকে দর্শন করিব এই আশায় বুক বাঁধিয়াছি। আজ রাত্রে এই স্থানেই থাকা হইল। এখানে কচুরি ভাজিয়া খাওয়া গেল। আহারান্তে নিদ্রাদেবীর স্মরণ লইলাম। আবার ভোর ৫টায় জামা জোড়া আঁটিয়া মুখ হাত ধুইয়া পথে বাহির হইলাম। প্রাতে ৩।৪ মাইল নিত্যই হাঁটিতাম ও মধ্যে মধ্যে কাণ্ডিতে উঠিতাম। পাছে ঠাণ্ডায় জ্বর হয় কি সর্দ্দি কাশি হয় এ জন্য খুব সাবধানে থাকিতাম। পাছে দেব দর্শনের ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে সতর্কতায় চলিতাম। এই স্থানে ছোট ছোট দুই তিনটী চটী পার হইয়া আমরা রামপুর আসিলাম। পথে দেখিলাম যাত্রীদল অক্লান্ত পরিশ্রমে হাঁটিতেছে। সকলেই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া নির্ভয়ে অদম্য উৎসাহে ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া ছুটীয়াছে। আমরা রামপুর চটীতেই স্নান আহারের ব্যবস্থা করিলাম। রামপুর চটীটী ভাল। চাল ডাল আলু ঘি সবই পাওয়া গেল। আমি স্নান পূজা করিয়া আলুভাতে দিয়া অন্ন পাক করিয়া শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া আহার করিলাম।

এইখানে একটু দুধ পাওয়া গেল। পথের মধ্যে কোন কোন চটীতে দুধও পাওয়া যায়। তবে যে যাত্রীদল আগে পৌছায় উহা তাদের ভাগ্যেই মিলিয়া থাকে। গোলাপ সিং বলিল মাইজী কাল ত্রিযুগী-নারায়ণ দর্শন হয়েগী। সাত মাইল চড়াই উঠিতে হইবে। চড়াই শুনিলে আমার ভয় হয়। মনে হয় দুর্ব্বল শরীরে কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিব। রামপুর হইতে আমরা অগস্ত্য আশ্রম আসিলাম। পথের দুই পার্শ্বে অত্যুঙ্গ গিরিমালা, তাহার শিখর বন-দেবদারু বৃক্ষ রাজিতে পূর্ণ। এই স্থান হইতেই অদূরে রজত গিরির ন্যায় হিমালয় শিখর দর্শন হইতেছে—যেন শত শত মণি জ্বলিতেছে। শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন হিমগিরিতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া কি সুন্দর হীরকের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সম্মুখে মহাতপা অগস্ত্যের আশ্রম—যিনি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, যাঁহার তপঃ প্রভাব অসীম ছিল। সেই অমিতপ্রভাব অগস্ত্যের পুণ্যস্মৃতি আজিও ভারতের বক্ষে জাগ্রত রহিয়াছে। দেখিয়া নয়নে জল আসিল। স্থানটী যেমন নির্জ্জন তেমনি পবিত্র। নীরব প্রশান্ত বনভূমি সমতল স্থান—চারিদিকে দেবদারু বনে বেষ্টিত। এই স্থানে একটী পাষাণময় মন্দির মধ্যে মহামুনি অগস্ত্যের ও তৎপত্নী লোপামুদ্রার পাষাণময় মূর্ত্তি আছে। আমি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে বারংবার তাঁহাদের প্রণাম করিলাম ও দর্শন করিয়া কাণ্ডিতে উঠিলাম এবং ত্রিযুগীনারায়ণ উদ্দেশে চলিলাম। যতই পার্ব্বত্য পথে উঠিতেছি ততই প্রবল শীত। দুই মাইল পথ আসিয়া পাটিগাড় নামক স্থানে আসিলাম। এইস্থান হইতে বামদিকের রাস্তায় ত্রিযুগীনারায়ণ যাইতে হইবে। একটা কাঠের পুল পার

হইয়া ত্রিযুগীনারায়ণের পথে চলিলাম। রাস্তা বড় কদর্য্য। পাণ্ডা বলিলেন এই স্থান হইতে একটী রাস্তা নোনপ্রয়াগ গিয়াছে। দ্বিতীয় রাস্তা বামদিকের চড়াই রাস্তা।

দেখিলাম পথের মধ্যে মধ্যে গ্রামগুলিতে পাহাড়ীদের পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন আবাস গৃহগুলি পাহাড়ের গাত্রে দেখা যাইতেছে। সকলেরি কতকগুলি করিয়া গো মহিষ ছাগল আছে। সকলেরই দশ পাঁচ বিঘা করিয়া জমিজারাত আছে এবং গো-মহিষ ছাগ সকলেই পালন করিতেছে। বোধ হয় এক এক জনের এক শত দেড় শত ছাগপাল আছে এবং চমরী গাইও আছে। উত্তরাখণ্ড যাইবার পথের সর্ব্ব-স্থানেই দেখিলাম পাহাড়ি পুরুষেরা হলচালনা করিতেছে এবং পাহাড়ি রমণীরা যব গোধূম প্রভৃতি শস্যকর্ত্তন করিতেছে। কেহ শস্য কাটিতেছে কেহ আঁটি বাঁধিতেছে। কেহ বা শস্যের বোঝা বহিয়া গৃহে লইয়া যাইতেছে। কেহ শস্য আছড়াইয়া পৃথক্ করিতেছে। ছোট ছোট বালক বালিকারাও পিতামাতার কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। কোন কোন স্থানে পাহাড়ি বালকগণ ছাগ মেষ গোচারণ করিতেছে। পাহাড়ি রমণীরাও গরু চরাইতেছে। উচ্চ পাহাড় হইতে ঘাস কাটিয়া আনিতেছে। ইহাদের চাষবাসের অবস্থা আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক ভাল। ইহারা সকলেই বলিষ্ঠ, শরীর খুব পরিশ্রম-সহিষ্ণু। পাহাড়ি রমণীরা সুন্দরী ও সবল শরীর। রমণীরা এক একটী লুঙ্গি বা ঘাঘড়ি পরা। এক একটী ঘাঘড়িতে ৫।৭ গজ কাপড় আছে। গায়ে গরম কাপড়ের বডি আছে। ঘাঘড়ীর উপর এক একখানা ডোরাকাটা কম্বল বাঁধা। পাছে ঘাঘড়ী ময়লা হইয়া যায় এজন্য

উপরে কম্বল বেষ্টন করিয়া ইহারা গৃহকার্য্য করিয়া থাকে। রমণীদের ও পুরুষদের কোমরে এক এক খানা দা বা কাটারি বাঁধা আছে। পাহাড়ি রমণীরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধর গোলগাল গঠন, সকলেই শ্রম-পরায়ণা। বেশ সহাস্যমুখে নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে। ইহাদের ছেলেমেয়েগুলিও পাজামা, জামা, টুপি পরা। আমাদের দেশের ছোট লোকের পোষাক অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রধান কারণ ইহারা শীত-প্রধান দেশে বাস করে। এজন্য ইহাদের কাপড় জামা বেশী চাই। অনাবৃত দেহে এখানে এক মুহূর্ত্ত থাকা চলে না। পাহাড়ি রমণীরা গৃহকার্য্য করিতেছে। উচ্চ পাহাড়ে উঠিয়া বড় বড় তাম্রকলস মস্তকে করিয়া ঝরণা হইতে জল আনিতেছে; স্বামী পুত্রের জন্য পাক করিতেছে, সন্তান পালন করিতেছে আবার ক্ষেত্রে শস্য কর্ত্তন করিতেছে। আবার দেখিলাম অনেক রমণী কম্বল বুনিতেছে। আমাদের দেশের মেয়েরা কুড়ি বছরে দুই ছেলের মা হইয়া বুড়ি হইয়া বসেন, এখানকার পাহাড়ি মেয়েদের সুন্দর সবল শরীর, প্রফুল্ল মুখকান্তি ও পরিশ্রমের ঘটা দেখিলে লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিবেন না। পাহাড়ি নারীদের অলঙ্কার-প্রিয়তাও খুব। রমণীরা নাসিকায় বড় বড় ফাঁদিনথ পরিয়া কর্ণে নানাপ্রকার কর্ণাভরণ পরিয়া থাকে। কণ্ঠে কণ্ঠহার হাঁসুলি প্রভৃতি পরে, হস্তও নানারকম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। নানারঙ্গের বস্ত্র পরে; সপ্তমীর চাঁদের মত প্রশস্ত ললাটে সিন্দুর ফোটা ও টিকলি পরা। যাহোক পাহাড়ি রমণীদের আচার ব্যবহার দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। রাস্তায় দলে দলে

তাহারা যাইতেছে, যাত্রী দেখিলেই 'সুঁইতাগা বিউনি দেও মায়ী' বলিয়া থাকে।

তাহার পর রুদ্রপ্রয়াগ ছাড়াইয়া ছাত্তৌনি চটী আসিলাম। এখান হইতে গঙ্গা একটু দূর; সম্মুখে দুই খানা দোকান ও একটী ঝরণা আছে।

চটীর মাথা খানকতক গাছের ডালপালা লতাপাতা দিয়া ঢাকা। আর চটীর চতুর্দ্দিকই খোলা। অন্ধকার রাত্রিতে এই জনমানবহীন পর্ব্বতের মধ্যস্থলে যদি রাত্রে বাঘ ভল্লুক আসিয়া আমাদের প্রাণ-সংহার করে তাহা হইলে আর সংবাদ দিবার লোক থাকিবে না। কিন্তু করুণাময় ভগবানের কৃপায় আমাদের পায়ে একটি কাঁটাও ফুটে নাই। তিনিই আমাদের এই জনহীন প্রান্তরে একমাত্র সাথী।

আহার আদি করিয়া ছাতৌনি চটী ছাড়িয়া দুই মাইলের পরে মঠ চটী আসিলাম। এই স্থানেই আজ থাকা হইবে। গৌরবাবু ও তাহার ভগ্নী যদিও পদব্রজে গমন করিতেছেন তথাপি তিনি বলিষ্ঠ দেহ, সবল শরীর; আমাদের বহু পূর্ব্বে তিনি চটীতে আসিয়া আমাদের জন্য স্থান রাখিতেন। নতুবা যাত্রীর ভিড়ে চটিতে স্থান পাওয়া দুর্ঘট। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার চতুর্দ্দিক বেড়াইলাম। যে দিকে চাই ধূম্রবর্ণ শৈলমালা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। এখানে ৩,৪ খানা দোকানও আছে। ঝরণার জলটীও মধুর। সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া হালুয়া রুটী খাইয়া শয়ন করিলাম। শয়নমাত্রেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম। স্থান কাল তখন আর কিছুই মনে রহিল না। ভোর ৪॥০ সময় কাণ্ডিওয়ালা

আসিয়া ডাকিল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া কাপড় পরিয়া রওয়ানা হইলাম কিন্তু দুই পা যাইতে না যাইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল। পাহাড় হইতে বৃষ্টির জলধারা ঝনঝন শব্দে নামিতে লাগিল। উৎসগুলি হইতে প্রবল বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। এস্থানে লোকালয় নাই। বিজন বনপথ—'মধুসূদন রক্ষাকর' বলিয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিলাম। বিপদভঞ্জন হরিকেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পর্ব্বতগাত্রস্থিত বৃক্ষ সকল ঝড়ের বেগে মড়্মড় শব্দে দুলিতে লাগিল। প্রকৃতির তাণ্ডব মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলাম কিন্তু প্রভুভক্ত পাহাড়ীরা এই ঝড় বৃষ্টিতে আমাদিগকে স্কন্ধে করিয়া ছুটিতে লাগিল। একঘণ্টা ছুটিয়া তাহারা একটী ছোট চটীর মধ্যে আমাদের পৌছাইয়া দিল। রাত্রে ঝড়বৃষ্টি মেঘ দুর্য্যোগে এই চটীতেই কাটাইতে হইল। বৃষ্টির জলের ঝাপটায় সমস্ত ভিজিয়া গেল। চটীওয়ালার কাছে এক আনার কাঠ কিনিয়া তাই অনেক কষ্টে জ্বালিয়া হাত পা গুলা একটু গরম করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। আমাদের মত সকল যাত্রীই এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, রাত্রে এই চটীতেই বাস করিলেন। চটীর তিন দিক খোলা। মাথায় আচ্ছাদন মাত্র আছে।

মঠ চটী হইতে রামপুর চটী নয় মাইল। আমরা এইস্থানে আহার আদি বেলা এগারটার মধ্যে সমাপ্ত করিলাম। আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দেখিতে দেখিতে একপশলা বৃষ্টি আসিল। আমরা তাড়াতাড়ি বৃষ্টি ছাড়িলেই বাহির হইলাম, কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতেই খুব শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। চারিদিক অন্ধকার। হঠাৎ এত ঝড় উঠিল যে আমার ছাতাটি ভাঙ্গিয়া গেল: এই পার্ব্বত্য রাস্তার

মধ্যে মহাবিপদে পড়িলাম। আবার শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে সেই চটী তিন মাইল দূরে। আমরা কম্বল মুড়ি দিয়া ছুটিতেছি, গোলাপ সিং বলিল মাইজী বহুত পাথর গিরেগা। আমি বলিলাম নিকটে যদি পর্ব্বতের গুহা থাকে শীঘ্র চল নতুবা শিলাবৃষ্টিতে রাস্তায় মরিতে হইবে। খানিকটা পথ দৌড়িয়া একটী পর্ব্বতের গুহার মধ্যে আসিয়া প্রাণ রক্ষা করিলাম! বোধ হয় ভগবান্ কৃপা করিয়া নিরাশ্রয় পথিকগণের জন্য পাহাড়ের মধ্যে এই গুহা করিয়া রাখিয়াছেন। গুহাট ছোট—মাথার উপর পাহাড়টী যেন ছত্র ধরিয়া আছে। আমাদের ৩ জন কাণ্ডিওয়ালা, বোঝাওয়ালা, আমরা ৩ জন স্ত্রীলোক এই গুহামধ্যে আশ্রয় লইয়া বসিয়া রহিলাম। তখন বেলা প্রায় ২টা বাজিয়াছে ; এক ঘণ্টা বৃষ্টি হইয়া গেল তথাপি মেঘ কাটিল না। গৌরবাবু ইতিপূর্ব্বেই আমাদের অগ্রগামী হইয়াছেন। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্‌সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। আমরা ভাবিলাম সন্ধ্যা হইলে এই বনের মধ্যে বাঘ-ভালুক আসিবে। অগত্যা বৃষ্টির বেগ থামিলে পথে বাহির হইলাম—কোন প্রকারে চটীতে পৌঁছাইতেই হইবে।

দুই তিন মাইল আসিলে মেঘ করিয়া বৃষ্টি আসিল। অগত্যা নিকটে একটী চটীতেই রহিলাম। ক্রমে বৃষ্টি খুব আরম্ভ হইল। এখানে দুইখানা দোকান ছিল, দূরে একটী ঝরণা ছিল। গোলাপসিং জল আনিয়া দিলে পূজা পাঠ করিয়া খেচরান্ন পাক করিয়া আহার করা গেল। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিল। এ চটীটী থাকিবার মত নহে দেখিয়া আহারাদি করিয়া গৌরবাবু আগেই বাহির হইলেন।

আমরাও পশ্চাৎ চলিলাম। আধ মাইল যাইতে না যাইতেই বড় বড় শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেশ ঝড় উঠিল। চটীও দুই মাইল দূরে। পথে কোথাও আশ্রয় স্থানও নাই। আমি কাণ্ডি হইতে নামিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া ছুটিলাম আমার সঙ্গিনীও আমার অনুসরণ করিলেন। মনে হইল বুঝি বা পাহাড় হইতে ঝড়ে উড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। হাওয়ার কি জোর! গোলাপ সিং বলিল মাই পাথর যব বহুত গিরেগা ত' রাস্তা মে মরোগে। আমি মনে মনে ইষ্টজপ করিতে করিতে বলিলাম 'নিকটে পাহাড়ের গুহা আছে শীঘ্র চল'। খানিকটা দৌড়িয়া আসিয়া একটী ছোট গুহা পাইলাম। কোন ক্রমে মাথাটা তাহাতে বাঁচিল, খানিকটা শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল।

একটু পরিষ্কার হইল দেখিয়া আবার হাঁটিতে লাগিলাম। চটীতে যে প্রকারে হয় পৌঁছাইতেই হইবে। এ সব অরণ্য পথে রাত্রি হইলে হিংস্রক জন্তুও বাহির হইতে পারে। গোলাপ সিং বলিল 'মাই শীঘ্র কাণ্ডিমে উঠ, জোর বুন্দি আবে গা'। আমরা কাণ্ডিতে উঠিলাম। কিছুদূর গিয়াই সন্‌সন্‌ করিয়া বৃষ্টি আসিল। ক্রমে বৃষ্টির বেগ প্রবল হইল। পাহাড় হইতে বৃষ্টির জল কল কল শব্দে নামিতে লাগিল। উৎস হইতে বিষম বেগে জলধারা পড়িতে লাগিল। এ স্থানে পার্ব্বত্য পথ—লোকালয় নাই। নির্জন অরণ্য ভূমি। একাগ্রমনে 'মধুসূদন, রক্ষা কর' বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। পর্ব্বতস্থিত বৃক্ষ সকল ঝড়ে আন্দোলিত হইয়া মড় মড় শব্দ করিতে লাগিল। প্রকৃতির তাণ্ডবমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলাম। এই বৃষ্টি মাথায় করিয়া কাণ্ডিওয়ালারা আমাদের মাথায় লইয়া চলিল। দেখিতে

দেখিতে একটা চটীতে আসিয়া পৌছিলাম। চটীটী ছোট, বৃষ্টির জন্য আমাদের মত অনেক যাত্রীই এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। সমস্ত দিনটা মেঘ বৃষ্টিতে কাটিল। সন্ধ্যার সময় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। খানকত রুটী করিয়া খাইয়া উনানের পার্শ্বে কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি ঝড় বৃষ্টি চলিল, জলের ঝাপটায় চটী ভাসিয়া গেল। চটীর তিন দিক্‌টা খোলা, মাথাটা শুধু রক্ষা করিতেছে। এইরূপে অনিদ্রায় রাত্রি কাটিল। আমাদের মত অনেক যাত্রীই এইরূপ কাপড় চোপড় ভিজিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল ভগবান্ সাধনার বস্তু —এমন কি সাধনা করিয়াছি যে সুলভেই তাঁহার দর্শন পাইব? শুনিয়াছি বিনা তপস্যায় ভগবানের কেহ দর্শন লাভ করিতে পারে না। বোধ হয় তাই সুদূর হিমালয়ে তিনি বাস করিয়া যাত্রীদের পথে তপস্যার ক্লেশ দিয়া বিশুদ্ধ করিয়া তবে দর্শন দান করিবেন। বদরিকা যাত্রীগণ এই সুদীর্ঘ পথে সংযম অভ্যাস করিয়া তাঁহার নাম জপ করিয়া দিনান্তে হবিষ্যান্ন করিয়া কম্বলাশনে শয়ন করিয়া সত্যনিষ্ঠ হইয়া চলিলে তবে শ্রীভগবান্ তাহাদের মনের মলিনতা দূর করিয়া তাহাদিগকে দর্শন দিয়া থাকেন। আজ এই কথাটি বার বার মনে হইল যে বিনা সাধনে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না। নতুবা প্রভু! জগতের সমস্ত রাজ্য ছাড়িয়া তুমি চিরহিমানীমণ্ডিত হিমালয় শিখরে অবস্থান করিবে কেন? এ স্থানে মানবের কোলাহল নাই, দ্বন্দ্ব নাই দ্বেষ নাই -নির্জ্জন বাস করিতেছ। তুমি আমাদের আকর্ষণ করিয়া না আনিলে আমাদের কি শক্তি ছিল যে লক্ষ লক্ষ গিরিমালা অতিক্রম

করিয়া দর্শনে আসিব। তুমি যে ঠাকুর ভক্তবৎসল, চিরদিনই ভক্তকে পোষণ করিয়া থাক। সেই তপস্যায় আজ তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। দেখিলাম ক্রমে নিশা অবসান হইল।

ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে আকাশ পরিষ্কার, প্রভাত অরুণের রক্তিমরাগ পূর্ব্ব গগনে দেখা দিতেছে। প্রাতে উঠিয়াই বিছানাপত্র বাঁধিয়া সকলেই অদম্য উৎসাহে হাটিতে লাগিলাম। পথে বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল। প্রভাত সূর্য্যকিরণে জগৎ হাসিয়া উঠিল। বনকুসুমের গন্ধে দশদিক ভরিয়া গেল। বৃক্ষশাখাস্থিত পাহাড়ি বুলবুলের গান শুনিতে শুনিতে আনন্দে চলিলাম। তাহার সহ নির্ঝরের কলতান মিশিয়া কর্ণবিবরে যেন অমৃতধারা ঢালিতেছিল। এক মাইল আসিয়া আমরা ছোট নারায়ণের মন্দির দেখিলাম। এখানে মন্দির মধ্যে নারায়ণের সুন্দর মূর্ত্তি আছে। তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিয়া আমরা সাড়ে তিন মাইল পথ চন্দ্রাচটী আসিলাম। এখানে চন্দ্রশেখর মহাদেব ও দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডা বলিল এই স্থানে ক্ষুদ্র চন্দ্রানদীর সহ মন্দাকিনীর সঙ্গম হইয়াছে। কাঠের পুলের উপর দিয়া নদী পার হইলাম। নদীপার হইতে প্রত্যেক কাণ্ডিওয়ালার দুই আনা করিয়া মাশুল লাগিল। মানুষের মাশুলও দুই পয়সা করিয়া দিতে হইল। এই চন্দ্রাচটীতে মোটঘাট রাখিয়া চন্দ্রা ও মন্দাকিনী সঙ্গমে স্নান করিয়া পূজাদি করিলাম। এখানে ২।৩ খানি দোকান আছে। নিকটে জলের ঝরণা আছে। পরে পাকাদি করিয়া আহার করিলাম। আহারের পর বেলা ৩টার সময় আবার তল্পি বাঁধিয়া

চলিতে আরম্ভ করিলাম। ৪ মাইল আসিয়া ভীরিচটি। এখানে মন্দাকিনীর লৌহসেতু আছে। সেতুর নিম্নে ভৈরবগর্জ্জনে মন্দাকিনী ছুটিতেছেন। এখানে ৩।৪ খানি দোকান আছে। সম্মুখে ঝরণার জল অবিশ্রান্ত পড়িতেছে। রাত্রে এই স্থানেই বিশ্রাম হইল। আবার প্রাতে উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া জয় বদরী বিশাল বলিয়া চটী হইতে বাহির হইলাম। তিনমাইল আসিয়া কুণ্ডচটী পৌছিলাম। এই স্থান হইতে তিন মাইল চড়াই উঠিয়া তবে গুপ্তকাশী যাইতে হইবে। আমাদের পাণ্ডা গৌরবাবু আজ এই চটীতেই রাত্রি বাস করিবেন স্থির করিলেন। প্রাতে আমরা গুপ্তকাশী দর্শন করিব স্থির হইল। সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম। চটীতে পাহাড়ি মাছির উপদ্রবটা বড় বেশী। প্রাতে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করিব—এই আনন্দে রাত্রি কাটাইলাম। ভোরে উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। আমার শরীর দুর্ব্বল, তাহার উপর হৃৎপিণ্ডও দুর্ব্বল—চড়াই উঠিতে অত্যন্ত হাপ ধরে। অগত্যা কাণ্ডীতেই উঠিলাম। দূর হইতে গুপ্তকাশী দেখা যাইতেছিল, পাহাড়ের ছোট ছোট বাড়ীগুলি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আমরা গুপ্তকাশী আসিয়া কমলী বাবার ধর্ম্মশালায় পৌছিলাম। এই ধর্ম্মশালায় উত্তরাখণ্ডের যাত্রী অনেকেই আসিয়াছেন। গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী যাইবারও অনেক যাত্রী আছেন। আজ আমরা গুপ্তকাশী আসিয়া পৌছিয়াছি। গিরিপাদ মূলে আমাদের ক্ষুদ্র চটী যাত্রিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। আমাদের চটীর পার্শ্বদেশ দিয়া মন্দাকিনীর অসীম প্রবাহ তরতর বেগে ছুটিয়া যাইতেছে।

চাঁদের কিরণ যেন নিঙ্গাড়িয়া আমাদের শ্রান্ত দেহে ঢালিয়া দিতেছিল। মন্দপবন আমাদের পথশ্রান্ত দেহখানি স্নেহময়ী জননীর মত ব্যজন করিয়া ঘুম পাড়াইতেছিল। অজানা স্বপ্নের মত আমার প্রাণের মধ্যে যেন কি একটী মধুর রাগিণী ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। আমি সেই বিশ্বময়ের অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গে মগ্ন হইয়া নিমেষের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলাম। চক্ষুর সম্মুখে দেখিলাম বিশাল পাষাণময় মন্দির। শুভ্র রজতগিরির ন্যায় দেবাদিদেব শঙ্কর গৌরীসহ বিরাজমান রহিয়াছেন। শ্যামল বৃক্ষশাখায় অঙ্গ ঢাকিয়া কোকিল কুহুরবে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে। বসন্তের মধুর বাতাসে আম্র মুকুলের সুমিষ্ট সৌরভ আসিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় পূর্ণ করিতেছে। প্রকৃতি নূতন শোভা নূতন সম্পদে যেন বিভূষিত হইয়াছেন। লতায় লতায় ফুল ফুটিয়া যেন গিরিগাত্র গুলি নূতন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়াছে। চৈত্রমাসের আজ শুক্ল তৃতীয়া।

গুপ্তকাশী স্থানটী সুন্দর—পাহাড়ের উপর ছোট গ্রামখানি পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন। ৮।১০ খানা দোকান আছে। ডাক ঘর আছে। ধর্ম্মশালার পার্শ্বেই বিশ্বনাথ রহিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে অন্নপূর্ণার মন্দির। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে একটী বড় কুণ্ড আছে। দুইদিক হইতে দুইটী ধারা আসিয়া কুণ্ডমধ্যে পতিত হইতেছে। বৃহৎ দেবালয়, তাহার চারিদেকে প্রশস্ত অঙ্গন। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে গুপ্তদান করিতে হয়। আমরা ধর্ম্মশালায় মোটঘাট রাখিয়া এই কুণ্ডে স্নান করিলাম। ব্রাহ্মণ সংকল্প মন্ত্র পাঠ করিলেন। স্নানান্তে বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়া তাঁহার পূজা করিলাম। ভগবান্ বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া মন আনন্দে অভিভূত হইল। পরে অন্নপূর্ণা

মাতাকে দর্শন করিয়া পূজা করিয়া ধন্য হইলাম। এখানে দানের মাহাত্ম্য খুব বেশী। আমরা অবস্থা অনুযায়ী ব্রাহ্মণকে যথাসাধ্য অন্নবস্ত্র ভোজ্যপাত্র সহ দান করিলাম। এখানে নারিকেলের মধ্যে যাহার যেমন ইচ্ছা তাহা দিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে গুপ্তদান করিতে হয়। আমরাও গুপ্তদান করিলাম। এই দানের দ্রব্যগুলি ও ভোজ্য ৺কেদারের পাণ্ডা লইলেন। গৌরবাবু এই স্থানে কুড়ি টাকা মূল্যে সবৎসা গাভী কিনিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। কাশীর উষার মা ও একটী গাভী ২০ টাকায় কিনিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

আমরা স্নানপূজা দর্শনাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় গুপ্তকাশীতে প্রভু বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণামাতার আরতি দর্শন করিলাম এবং মন্দিরে দীপ-দান করিয়া বাসায় আসিয়া জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম। শয়নেও তাঁহারই চিন্তা করিতাম। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম গুপ্তকাশীর দক্ষিণভাগে মন্দাকিনী পার হইয়া ওখীমঠ আছে। রাত্রিশেষে নিদ্রা ভঙ্গে নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কাপড়চোপড় পরিয়া জয় বদরীবিশাল বলিয়া সকলেই গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। এখানে বড় ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। শীতও খুব। অগত্যা গরম কাপড় ও জুতা মোজা আঁটিয়া চলিতে লাগিলাম। গুপ্তকাশীর এক মাইল দূরে নালাচটী নামে চটী আছে। এই নালাচটী হইতে রাস্তা দুই দিকে গিয়াছে। কেদারনাথ দর্শন করিয়া এই নালাচটীতে সকলকেই আসিতে হইবে। একটী রাস্তা কেদারনাথের পথে গিয়াছে অন্য রাস্তাটী ওখীমঠ পার হইয়া বদরীনারায়ণের পথে গিয়াছে। নালাচটী পার হইয়া কিছু দূর আসিয়া আমরা মোতাদেবীর মন্দিরে আসিলাম

ও দেবীকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা নারায়ণ কোটী চটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সকলেই এই চটীতেই থাকা স্থির করিলেন। এই স্থানে মন্দিরের মধ্যে নারায়ণের মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানে দুই তিনখানি দোকান ও একটী ঝরণা আছে। আমরা স্নানাদি করিয়া নিত্যপূজা সমাপন করিয়া মন্দির মধ্যে গিয়া নারায়ণকে দর্শন করিলাম। পরে পাকাদি করিয়া আহার করা গেল। তারপর ২ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া বেবেঙ্গ্ চটী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই চটীর নীচে একটী নদী আছে। এই স্থান হইতেই কেদার যাত্রার চড়াই আরম্ভ।

রাত্রে এই চটীতেই থাকার ব্যবস্থা হইল। গোলাপসিং বলিল মাইজী আগাড়ী ভারি চড়াই মিলেগী। সে আমায় পাক করিবার জন্য কিছু কাষ্ঠ জল আনিয়া দিল। আমি রুটি প্রস্তুত করিয়া আহার করিলাম। আহারান্তে শ্রীভগবানের নাম করিয়া শয়ন করিলাম। ভোরে উঠিয়া আবার হাঁটিতে লাগিলাম। কেদারনাথেরপাঁণ্ডার পুত্র বিশ্বনাথ সুকুল আমাদের সঙ্গে বরাবর কেদার পর্য্যন্ত চলিতেছেন। ইহার বয়স অল্প হইলেও খুব বিনীত ও মিষ্টভাষী; তিনি সর্ব্বদা আমাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। পাণ্ডার জুড়িদারও আমাদের হাট বাজার করিয়া দিত। তাহার নাম ছিল দুর্গাপ্রসাদ। চারি মাইল আসিয়া আমরা দোলনাচটী আসিলাম। এখানে মহিষমর্দ্দিনীর সুন্দর মন্দির আছে ও মন্দির অভ্যন্তরে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি আছে। আমরা মাকে দর্শন করিয়া পাণ্ডাকে এক আনা দক্ষিণা দিলাম। আজ

১৭ই বৈশাখ। পাণ্ডা বলিতেছেন ২২শে শ্রীকেদার প্রভুর পাট খুলিবে। সেই দিনই আমরা কেদারনাথকে দর্শন করিব এই আশায় বুক বাঁধিয়াছি। আজ রাত্রে এই স্থানেই থাকা হইল। এখানে কচুরি ভাজিয়া খাওয়া গেল। আহারান্তে নিদ্রাদেবীর স্মরণ লইলাম। আবার ভোর ৫টায় জামা জোড়া আটিয়া মুখ হাত ধুইয়া পথে বাহির হইলাম। প্রাতে ৩।৪ মাইল নিত্যই হাঁটিতাম ও মধ্যে মধ্যে কাণ্ডিতে উঠিতাম। পাছে ঠাণ্ডায় জ্বর হয় কি সর্দ্দি কাসি হয় এ জন্য খুব সাবধানে থাকিতাম। পাছে দেব দর্শনের ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে সতর্কতায় চলিতাম। এই স্থানে ছোট ছোট দুই তিনটা চটী পার হইয়া আমরা রামপুর আসিলাম। পথে দেখিলাম যাত্রীদল অক্লান্ত পরিশ্রমে হাঁটিতেছে। সকলেই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া নির্ভয়ে অদম্য উৎসাহে ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। আমরা রামপুর চটীতেই স্নান আহারের ব্যবস্থা করিলাম। রামপুর চটীটী ভাল। চাল, ডাল, আলু, ঘি, সবই পাওয়া গেল। আমি স্নান পূজা করিয়া আলুভাতে দিয়া অন্ন পাক করিয়া শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া আহার করিলাম।

এইখানে একটু দুধ পাওয়া গেল। পথের মধ্যে কোন কোন চটীতে দুধও পাওয়া যায়। তবে যে যাত্রীদল আগে পৌঁছায় তাদের ভাগ্যেই মিলিয়া থাকে। গোলাপ সিং বলিল মাইজী কাল ত্রিযুগী-নারায়ণ দর্শন হয়েগী। সাত মাইল চড়াই উঠিতে হইবে। চড়াই শুনিলে আমার ভয় হয়। মনে হয় দুর্ব্বল শরীরে কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিব। রামপুর হইতে আমরা অগস্ত্য আশ্রম আসিলাম।

পথের দুই পার্শ্বে অত্যুচ্চ গিরিমালা, তাহার শিখর বন-দেবদারু বৃক্ষ রাজিতে পূর্ণ। এই স্থান হইতেই অদূরে রজত গিরির ন্যায় হিমালয় শিখর দর্শন হইতেছে—যেন শত শত মণি জ্বলিতেছে। শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন হিমগিরিতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া কি সুন্দর হীরকের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আমরা আজ মহাঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে আসিয়াছি। পথের দুইদিকে চাহিয়া দেখি যে বসন্তের আবির্ভাবে প্রকৃতি নবযৌবনা কামিনীর ন্যায় পত্রে, পুষ্পে, ফলে, ফুলে, যেন কানন ভূমি সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে; পুষ্প সম্ভার যেন মধুর ঝঙ্কার দিয়া বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। কত শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত লতাবধূর কমনীয় অঙ্গ সাজাইয়াছে, শাখায় শাখায় পক্ষীসকল গান করিতেছে। ক্ষুদ্র তটিনী সকল মন্থর গমনে প্রবাহিত হইতেছে ও মৃগ মৃগী সকল যূথবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে। আমরা পথশ্রান্ত হইয়া এই উন্মুক্ত আকাশ তলে সুকোমল গালিচার ন্যায় তৃণমণ্ডিত ভূমির উপর ক্ষণকাল শয়ন করিয়া ভাবিলাম, এই সেই অগস্ত্যাশ্রম—এই সেই মহামুনির তপস্যা ক্ষেত্র। ইহার চতুর্দ্দিকে ঘন সন্নিবিষ্ট দেবদারু বৃক্ষ-সারি বায়ুতে আন্দোলিত হইয়া যেন পথিক কুলকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছে। আমি ক্ষণকালের জন্য স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত নিমেষহীন নয়নে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম গিরিশিখরগুলি বিচিত্র বর্ণের মেঘে আচ্ছাদিত। শ্বেত, পীত, লোহিত, ধূসর—নানা বর্ণের খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি গিরিচূড়ার উপরিভাবে নানা আকারে ক্রীড়া হইতেছে কখনও বা শুভ্র লঘু

মেঘগুলি ধবল বলাকার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। আমি আকাশের এই অপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্য একাগ্রচিত্তে দেখিতে লাগিলাম। সঙ্গিনীরা বলিলেন মা ঠাকুরাণী কি দেখছেন। আমি বলিলাম কি জানি ভগবান্ যাহা দেখাইতেছেন তাহাই দেখছি। আজ অসীম প্রভাব ভগবান্ অগস্ত্যের সাধনাস্থান দর্শনে ধন্য হইলাম।

ইহা সেই মহাতপা অগস্ত্যের আশ্রম যিনি গণ্ডূষে সমুদ্রপান করিয়াছিলেন, যাঁহার তপঃপ্রভাব অসীম ছিল। সেই অমিতপ্রভাব অগস্ত্যের পুণ্যস্মৃতি আজিও ভারতের বক্ষে জাগ্রত রহিয়াছে। দেখিয়া নয়নে জল আসিল। স্থানটী যেমন নির্জ্জন তেমনি পবিত্র। নীরব প্রশান্ত বনভূমি—সমতল স্থান—চারিদিকে দেবদারু বনে বেষ্টিত। এই স্থানে একটী পাষাণময় মন্দির মধ্যে মহামুনি অগস্ত্যেরও তৎপত্নী লোপামুদ্রার পাষাণময় মূর্ত্তি আছে। আমি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে বারম্বার তাঁহাদের প্রণাম করিলাম ও দর্শন করিয়া কাণ্ডিতে উঠিলাম; এবং ত্রিযুগীনারায়ণ উদ্দেশ্যে চলিলাম। যতই পার্ব্বত্য পথে উঠিতেছি ততই প্রবল শীত। দুই মাইল পথ আসিয়া পাটিগাড় নামক স্থানে আসিলাম। এই স্থান হইতে বামদিকের রাস্তায় ত্রিযুগীনারায়ণ যাইতে হইবে। একটী কাঠের পুল পার হইয়া ত্রিযুগীনারায়ণের পথে চলিলাম। রাস্তা বড় কদর্য্য। পাণ্ডা বলিলেন এই স্থান হইতে একটী রাস্তা সোনপ্রয়াগ গিয়াছে। দ্বিতীয় রাস্তা বামদিকের চড়াই রাস্তা। অগস্ত্যাশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া দেখি বনভূমির কি নয়ন অভিরাম ছবি। কোথাও নির্ঝরের ঝর ঝর রব শ্রুত হইতেছে, কোথাও

ঝুনু ঝুনু তানে নির্জ্জন নীরব বনপথকে মুখরিত করিয়া ছুটিয়াছে।

ত্রিযুগী নারায়ণের পথে একটু অগ্রসর হইলে দেখিলাম যে, পথ ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে। পথটি অতি সঙ্কীর্ণ। পার্ব্বত্যপথ কোন কোন স্থানে নিতান্ত অপ্রশস্ত। কাণ্ডিওয়ালা পাকদাণ্ডির রাস্তা দিয়া খুব সতর্কতার সহিত এক পা এক পা করিয়া উঠিতে লাগিল। নীচের দিকে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। পথ এত দুর্গম ও এত চড়াই যে একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। পথের পার্শ্বেই গভীর খাত। মনে মনে কেদার প্রভুকে স্মরণ করিতে করিতে এই দুর্গম রাস্তা কতকটা অতিক্রম করিয়া আমরা শাকম্ভরী দেবীর মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া আবার চড়াই পথে উঠিতে লাগিলাম। এই সাত মাইল উঠিতে কাণ্ডিওয়ালারা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহাদের পৃষ্ঠে এক একটী দুইমণ করিয়া বোঝা। বেলা নয়টার সময় আমরা সাত মাইল চড়াই ভাঙ্গিয়া ভগবান্ ত্রিযুগী নারায়ণের দ্বারে আসিলাম। আজ ১৯শে বৈশাখ। কাশীর পণ্ডিতেরা ব'লিয়াছিলেন, আজ ৯টায় অশুদ্ধ কাল পড়িবে। তাই তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়াই অগ্রে ভগবান্ ত্রিযুগী নারায়ণকে দর্শন করিলাম। মন্দিরটি দেখিতে সুন্দর। বৃহৎ প্রস্তরময় মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীনারায়ণের অষ্টধাতু-নির্ম্মিত মনোহর মূর্ত্তি। পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। প্রাণ ভরিয়া নারায়ণের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। মন্দিরের সম্মুখভাগে যজ্ঞকুণ্ড, তাহাতে সর্ব্বদাই অগ্নি। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম, এই

স্থানের অগ্নি তিনযুগ ব্যাপী হইয়া সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে। এই খানে পুরাকালে শিবদুর্গার বিবাহ হইয়াছিল। সেই বিবাহকালীন অগ্নির তিনযুগের সাক্ষী স্বরূপ নারায়ণ তিনযুগ ধরিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

মন্দিরের বাহিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সরস্বতীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। ব্রহ্মাকুণ্ড ও শিবকুণ্ডে স্নান করিয়া বিষ্ণুকুণ্ডে তর্পণ করিতে হয়। এই স্থানটী পর্ব্বতের একটী শিখর দেশ। যাত্রীরা ঐ অগ্নিকুণ্ডে সকলেই ঘৃতাহুতি দিতেছেন ; কেহ বা ঘৃত, কাষ্ঠের মূল্য দিতেছেন। আমি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া বনকুসুম ও ধূপদীপ দ্বারা শ্রীভগবানের সাধ্যমত পূজা করিলাম। ভোগের জন্য একখণ্ড মিছরি দিলাম। সেই দিন বৈশাখী পৌর্ণমাসী ছিল। আমাদের কলিকাতার যাত্রীদের মধ্যে একটী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কথক আসিয়াছিলেন। তিনিও কেদার দর্শনে যাইতেছেন। আমি তাঁহাকে ঐ দিন নিমন্ত্রণ করিয়া লুচি তরকারি হালুয়া খাওয়াইলাম। এখানে বিস্তর যাত্রী জমা হইয়াছে। ঐ দিন ত্রিযুগীনারায়ণেই থাকা স্থির হইল। সেখানে যাত্রীদের ৮।১০ খানা ঘর ও ধর্ম্মশালা সদাব্রত আছে। আমরা কমলিবাবার ধর্ম্মশালার দোতলার উপর একটী ঘর লইয়াছিলাম। ঘরের ঠিকানা গৌরবাবু অগ্রে আসিয়া করিতেন। এখানে ভয়ানক শীত। পথশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যারপর চটীতে আসিয়া পৌছিলাম ও পথশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হইরা মিষ্টান্ন মুখে দিয়া এক ঘটি ঝরণার সুমধুর জলপান করিয়াই প্রগাঢ় নিদ্রায় অবিভূতা হইলাম। গভীর রাত্রে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম সকলেই নিদ্রামগ্ন। জ্যোৎস্না পুলকিতা

যামিনী। শীতল নৈশ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। নীলাম্বর তলে রজত জ্যোৎস্না রাশি যেন তাহার তন্দ্রালস দেহখানি এলাইয়া দিয়াছে—যেন তাহার শুভ্র অঞ্চলখানি তরঙ্গায়িত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নদীতটে বৃক্ষশাখায় বসিয়া পক্ষীগণ প্রভাত আলোক পাইবার জন্য এক একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছে। গিরিপাদমূলে ক্ষুদ্রা তটিনী চন্দ্র কিরণ ছটা অঙ্গে মাখিয়া যেন লহরে লহরে নৃত্য করিতেছে। আমাদের মাথার উপর অনন্ত অসীম মুক্ত আকাশ, তাহার নিম্নে অত্যুঙ্গ গিরিশ্রেণী। গিরি সানুদেশে আমাদের ক্ষুদ্র চটীখানি—তাহার মাথাটা ভূর্জ্জপত্রে আচ্ছাদিত। আর চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত বাতাস; নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি শুধু থাকিয়া থাকিয়া ঝিল্লিরব ঝিঝি শব্দ শোনা যাইতেছে। নৈশোৎফুল্ল কুসুম সৌরভ অঙ্গে মাখিয়া সুমন্দ পবন ধীরে ধীরে বহিতেছে। প্রকৃতির—এই ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, মনে হইল আমার আত্মীয় বন্ধুগণ যদি এই সুন্দর দৃশ্য দেখিতেন তবে না জানি কি আনন্দ হইত। এখন যদিও আমার স্বামী পুত্র কন্যা কেহ সঙ্গে নাই তথাপি আমার চিরদিনের সাথী চির আনন্দময় প্রভু আমার সঙ্গেই আছেন! এই ভাবিয়া আমার নয়নে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। কতক্ষণ পরে আমি আবার তন্দ্রাবিভূতা হইলাম।

আবার প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কাণ্ডিতে উঠিলাম। এখান হইতে শাকম্ভরী দেবীর মন্দিরের নীচের পথে নামিয়া কাঠের পুল পার হইয়া শোনপ্রয়াগ যাইতে হয়। এই স্থানে শোনগঙ্গার সহ মন্দাকিনী মিলিতা হইয়াছেন। এখান হইতে

শোনগঙ্গার পুল পার হইয়া দুই মাইল চড়াই গিয়া গণেশচটী আসিলাম। সেখানে মস্তকহীন গণেশের মূর্ত্তি আছে। সেখান হইতে তিন মাইল চড়াই উঠিয়া আমরা গৌরীকুণ্ডে আসিলাম। এখান হইতে ৭ মাইল উৎরাই রাস্তা পাহাড়ের উপর ঢালুপথে নীচে নামিয়াছে। গৌরী-কুণ্ডে আসিয়া দেখি যাত্রীদের ভয়ানক ভিড়। কোথাও একটু বসিবার স্থান নাই। সমস্ত কেদার যাত্রীরা এই স্থানে জমা হইয়াছে। ৫.৬ খানা চটী লোকে পরিপূর্ণ। বিন্দুমাত্র দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমাদের কেদারের পাণ্ডা বিশ্বনাথ স্থকুল, আমাদের আগে আসিয়া আমাদের জন্য একটু বসিবার স্থান রাখিয়াছিল।

চটীর মধ্যে এমন স্থান নাই যে পাক করিব। গৌরীকুণ্ডটী লোকবিশ্রুত স্থান। পাণ্ডারা বলিল, এই স্থানেই গৌরীদেবী শঙ্করকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানে গৌরীকুণ্ড ও গৌরীশঙ্করের মন্দির আছে। মন্দিরের পার্শ্বেই একটী তপ্ত কুণ্ড ও একটি শীতল জলের কুণ্ড আছে। তাহার পার্শ্ব দিয়া মন্দাকিনীর হিমশীতল ধারা আসিতেছে। এখানে শীত অত্যন্ত প্রবল। ২।৩ খানা কম্বল গায়ে দিয়াও শীত ভাঙ্গে না। এখানে স্নান করা দূরে থাক, গাত্রবস্ত্র খুলিবার সাধ্য নাই। অগত্যা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া একটু মন্দাকিনীর বারি মস্তকে স্পর্শ করিয়া স্নান পূজা সমাপ্ত করিয়া উঠানের এক পার্শ্বে বসিয়া দুটী আলুভাতে ভাত রাঁধিয়া আহার করিলাম। পূর্ব্ব দিন পুরী খাইয়া ছিলাম, আজ দুটী ভাত খাইতে হইবে এই ভাবিয়া পাক করিয়া কোন প্রকারে দুটী আহার করিলাম। এখানে কেদারনাথের পাণ্ডাদের দুই চারি খানা ঘর আছে; খানকতক

চটী আছে ও হালুইকারের ৪।৫ খানা দোকানও আছে। যাত্রীদের জন্যই তাহারা আগে আসিয়া দোকান করিয়াছে। দোকানীরা সব পাহাড়ী। মোটামোটা পুরী ও বিলাতি কুমড়ার তরকারি প্রস্তুত করিয়াছে। পুরীর ৩৲ টাকা সের, তাই পেটের দায়ে যাত্রীরা কিনিতেছে। তবে ঘিটি ভাল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটু সামান্য বৃষ্টি হইল। সমস্ত যাত্রী বৃষ্টির জন্য চটীতে আসিয়া আশ্রয় লইল। আমরা ভাবিলাম তিলমাত্র শয়নের স্থান নাই, বসিয়া রাত্রি কাটাইতে হইবে। আমাদের শয়ন স্থান যাত্রীপূর্ণ। যা হোক কষ্টে বসিয়া রাত্রি কাটান গেল। রাত্রি চারিটার সময় জয় কেদারস্বামীকো জয় বলিয়া যাত্রীদল বাহির হইল। আমরা মোটগুলা বোঝাওয়ালাকে দিয়া মুখহাত ধুইয়া প্রচুর শীতবস্ত্র পরিয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু সম্মুখে বিষম চড়াই দেখিয়া আর একপদ অগ্রসর হইতে পারিলাম না, অগত্যা কাণ্ডিতে উঠিলাম। এখান হইতে দুই মাইল গিয়া চীরবাস ভৈরব আছেন। যাত্রীরা এই চীরবাস ভৈরবকে নববস্ত্র দিতেছে। কেহ কেহ চীরখণ্ড দিতেছে। আমিও একখানি চীরখণ্ড দিলাম। এই স্থান হইতে নিবিড় বনপথ। পর্ব্বতের উপর হইতে গলিত তুষাররাশির হিমজল-ধারা নির্ঝরিণীরূপে ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে। এই স্থানের কিছু পরে ভীমবারী। এখানে ভীমসেনের বিশাল মূর্ত্তি আছে। আর একটা উচ্চ পাহাড়ের প্রকাণ্ড গুহা দেখা যাইতেছে। পাণ্ডারা বলিলেন, মহাপ্রস্থান সময়ে ভীমসেন ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ এই গুহায় বাস করিয়াছিলেন। গুহাটী ভীমকায়, দেখিলে ভয় হয়। এদিকের

রাস্তা ক্রমাগতই চড়াই। যেমন ভয়ানক রাস্তা তেমনি সঙ্কীর্ণ পথ। এই স্থান হইতে আমরা তিন মাইল দূরে রামবারী চটী আসিলাম। আমাদের চটীর পার্শ্ব দিয়া ভীষণবেগে মন্দাকিনী ছুটিতেছেন। তাহার কল্লোল শুনা যাইতেছে। আজ রাত্রে রামবারী চটীতে থাকিয়া কল্য প্রাতে ভগবান্ কৈলাসনাথের দর্শন হইবে। এখানে আমাদের অগ্রবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সমস্ত যাত্রীদল জমা হইয়াছে। প্রায় দুই হাজার যাত্রী আসিয়াছে। বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা খুব কম। পাঞ্জাবী, মারহাট্টি, সিন্ধীই বেশীর ভাগ। হিন্দুস্থানী অনেক। রাজপুতানা, বিকানির, জয়পুর হইতে বিস্তর যাত্রী এসেছে। রামবারী চটীতেও পাঁচ খানা লুচির দোকান বসিয়াছে। পাহাড়ীরা ছাগলের পৃষ্ঠে আটা ঘি চাউল চিনি ইত্যাদি বোঝাই দিয়া অসংখ্য ছাগপাল লইয়া এক চটী হইতে অন্য চটী যাইতেছে। ঐ ছাগপালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলঘণ্টা টুং টুং শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে। আজ আমরা রামবারীতেই থাকিব। কাল গৌরীকুণ্ডের চটীতে আমাদের বিছানাপত্র সমস্ত রাখিয়া শুদ্ধ দুইখানি কম্বল ও বস্ত্র দুইখানি ও কেদার প্রভুর পূজার সামগ্রী-গুলি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এই চটীতে যথেষ্ট ভিড়, কোনপ্রকারে রাত্রি কাটাইতে হইবে। কিন্তু এখন দোকানদার বলিতেছে আজ পাঁচ দিন হইতে প্রত্যহ কেদারনাথে বরফ পড়িতেছে।

গৌরীকুণ্ড হইতে রামবারী চটী ৩ মাইল। এই স্থানকে সত্যপথ বলে। এই তিন মাইল পথের কি মনোমুগ্ধকর ছবি তাহা বর্ণনা করা যায় না। এ পথটী দেবমার্গ, তার আর সন্দেহ নাই। গৌরীকুণ্ড হইতে কেদারনাথের পথ স্বর্গপথ বলিয়াই মনে হয়। পথ যদিও খুব

চড়াই বটে কিন্তু পথের দুই পার্শ্বে অসংখ্য দেবদারু বৃক্ষগুলি সরলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এবং স্থলপদ্মের ন্যায় বিকসিত কুসুমে পথের দুইধার আলো করিয়া রহিয়াছে। কোন কোন বৃক্ষ আপাদ মস্তক পুষ্পস্তবকে আবৃত। পুষ্পগুলি একজাতীয় কিন্তু বিবিধ বর্ণের। কোনগুলি রক্তকমলের ন্যায়, কোনগুলি সিন্দূরবর্ণ, কোনগুলি গোলাপী। এই পুষ্প দেখিতে অবিকল স্থলপদ্মের মত। স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা করিয়াছে! আমি কাণ্ডিওয়ালাকে চারটী ফুল পাড়িয়া দিতে বলিলাম, সে পাড়িয়া দিল। পুষ্পের সৌরভে আর মন্দ মন্দ হিমশীতল বাতাসে আর ধবল মুক্তাময়ী মন্দাকিনীর বারিরাশি দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া গেলাম। আর পুষ্পস্তবকাভিনম্রা লতা সকল পুষ্পে পুষ্পে আবৃতা দেখিয়া মনে হইল এই স্বর্গপথ।

রামবারী হইতে কেদার ৩ মাইল পথ। ইহা হিমালয়ের একটী শিখর; এই স্থানকে লোকে কৈলাস পর্ব্বত বলে। আমাদের চক্ষুর সন্মুখে ঐ রজত গিরিনিভ অপূর্ব্ব কৈলাস পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, যেন সহস্র সহস্র হীরকখণ্ড সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছে। আমাদের আজ বিপুল আনন্দ। কাল আমরা ভগবান্ কেদারনাথকে দর্শন করিয়া মনঃপ্রাণ শীতল করিব। মনে মনে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। কিন্তু ছাগপালকগণ বলিল, মাইজী বহুত বরফ মিলেগী, চারি মাইল বরফ। এই কথা শুনিয়া চক্ষে জল আসিল। ভাবিলাম, প্রভু! আমি দীনহীন আমায় কি তুমি দর্শন দিবে না? আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছি যে তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিব? আজ

মেঘমণ্ডল সংস্পর্শী হিমালয় দর্শন করিয়া আতঙ্কে আমার হৃদয় শিহরিয়া উঠিতেছে। হিমালয় ত' ঠাকুর মেঘের উপর, আমি কি ঐ তুষারের রাজ্য ভেদ করিয়া অতদূরে উঠিতে সক্ষম হইব? কখনই পারিব না। এই চিন্তায় আমার মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। বেলা চারিটার সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। যাত্রীদের হৃদয় ভয়ে শুকাইয়া গেল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রে বরফ পাত হইবে। এই চিন্তায় সকলেই উদ্বিগ্ন হইল। সমস্ত রাত্রি যাত্রীরা ব্যাকুলপ্রাণে কেদারনাথকে ডাকিতে লাগিল। আমারও ভাবিতে ভাবিতে মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। কাঁদিয়া বলিলাম, ঠাকুর! আজ একুশ দিন অনাহারে অনিদ্রায় তোমার চরণ দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসিতেছি তবে কি দর্শন দিবে না? ঠাকুর! তিলমাত্রও যেন তোমার দর্শন পাই। এই বলিয়া কতই কাঁদিলাম। সন্ধ্যার সময় ঝড় উঠিল দুইচারি ফোটা বৃষ্টিও পড়িল। কাণ্ডিওয়ালারা গুহায় গিয়া আশ্রয় লইল। সমস্ত রাত্রি দুর্ভাবনার সীমা নাই। মনে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়িল। কিরূপে কাল বরফের উপর দিয়া চলিব, কিরূপে কাল কৈলাস-নাথকে দর্শন করিব। ঠাকুর! বল দাও, শক্তি দাও। একবার যেন তোমায় দেখিয়া ধন্য হই। যাত্রীদের মধ্যে কেহ বলিল তিন মাইল বরফ। কেহ বলিল চারি মাইল বরফ। কেহ বলিল বরফে কাণ্ডি চলিবে না নিজের বলে যাইতে হইবে। সমস্ত রাত্রি কেদার-নাথের দর্শন চিন্তায় ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতেছি কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলাম, একজন জটামণ্ডিত ভীমকায় পুরুষ ত্রিশূল হস্তে আমায় লইয়া আমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। তাঁহার

পদ-শব্দ আমি বেশ অনুভব করিলাম। এই সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল, মন যেন আর পূর্ব্বের মত দুর্ব্বল নাই। মনে মনে বলিলাম, ঠাকুর! এই দীনহীন কাঙ্গালকে ভীত দেখিয়া তুমি লইতে আসিয়াছ? তা বেশ লইয়া চল, আর আমার মরণের ভয় নাই। তোমার অভয় চরণ যে প্রাপ্ত হয় তাহার কি মৃত্যুভয় থাকে? মরিতে হয় তোমার চরণপ্রান্তে মরিব। তখন রাত্রি প্রায় চারিটা বাজিয়াছে। গৌরবাবু আমায় ডাকিয়া বলিতেছেন, মা ঠাকরুণ! কেদার দর্শনে চলুন। আমি বলিলাম, বাবা চল, আজ প্রভু যে আমায় নিতে এসেছেন। তখন সকলে উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া পট্টবস্ত্রাদি পরিয়া জয় কেদার স্বামীকো জয় বলিয়া, কেদারনাথের পূজার উপহারগুলি নূতন গামছায় বাঁধিয়া লইয়া একটি কমণ্ডলু পাত্র লইয়া চলিলাম। গোলাপ সিং আমায় কাণ্ডিতে উঠিতে বলিল; তখন সকলেই মহা উৎসাহে জয় কেদার বলিতে বলিতে রামবারী চটী হইতে বাহির হওয়া গেল। রামবারী হইতে কেদার তিন মাইল। এ স্থান দেখিয়া মহাকবির সেই বর্ণনা মনে পড়িল—

> অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
> হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ
> পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
> স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।

হিমালয়ের অপূর্ব্ব শোভা, মহাকবির বর্ণনার সার্থকতা আজ উপলব্ধি করিলাম। এস্থান হইতে ভগবান্ শ্রীকেদারনাথের মন্দির তিন মাইল। কেবল ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছি। মনে হইতেছে যেন

মেঘরাজ্যে উঠিতেছি। আর সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায়, রজতগিরির ন্যায় চিরতুষারাবৃত ধবল কৈলাস শৃঙ্গ দর্শন করিয়া বারম্বার শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিতেছি। আর বলিতেছি, ঠাকুর! মহাপাতকীকে দর্শন দিও। হিমে সর্ব্বশরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছে। আমরা গরম জামা পরিয়া ধোসা গায় মোজা পায় তাহার উপর পট্টি বাঁধিয়া মাথায় কাণ-ঢাকা টুপি দিয়া দড়ির জুতা পায়ে লাঠিহস্তে ধীরে ধীরে চলিতেছি। আমাদের তিনজন বোঝাওয়ালা ও তিনজন কাণ্ডিওয়ালা রক্ষকরূপে আমাদের সঙ্গে চলিয়াছে। আর কেদারনাথের পাণ্ডা বিশ্বনাথ ও দুর্গাপ্রসাদ চলিয়াছে। কিন্তু পাহাড়ীরা খুব নির্ভীক। তাহারা অত্যুচ্চ গিরিতে সর্ব্বদাই বাস করে, সর্ব্বদা পাহাড় হইতে ওঠা নামা করে, ও বরফের উপর হাঁটা তাহাদের অভ্যাস আছে। এজন্য তাহারা ভীত নয়। গৌরবাবু ও তাঁহার ভগ্নী আমাদের অগ্রে হাঁটিয়া চলিলেন। আমিও আমার দুইটি কাশীর বৃদ্ধা সঙ্গিনী, এতটা পথ কাণ্ডিতেই আসিলাম। হিমালয় গাত্রে ক্ষুদ্র পিচ্ছিল তুষারাবৃত পথ—অতি সাবধানে সতর্কতায় কাণ্ডিওয়ালা আমাদের লইয়া চলিতে লাগিল। যদি একবার পদস্খলন হয় তবে আমাদের চিহ্ন থাকিবে না। খানিক পথে আর কাণ্ডি চলিল না, অগত্যা আমরা হাঁটিয়া চলিলাম—এ পথে আর এখন কেহ কাহারো সঙ্গী নয়। পশ্চাৎ দিকে চাহিতে পারি না। সকলেরই এক লক্ষ্য। ব্যাকুল প্রাণে সকলেই 'কেদার দর্শন দাও' বলিয়া, মনে প্রাণে ডাকিতে ডাকিতে চলিয়াছে। কি ভয়ানক ঠাণ্ডাবাতাস, সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া যাইতেছে। হাত পা জ্বলিয়া যাইতেছে। যতই ঊর্দ্ধে উঠিতেছি

আর জনমানবের চিহ্ন নাই, ভূমির চিহ্ন নাই, বৃক্ষ নাই লতা নাই তৃণ নাই।

আমাদের চরণের নিম্ন হইতেই আকাশস্পর্শী চিরহিমানীমণ্ডিত হিমালয়। একি স্বপ্নরাজ্যে আসিলাম! দেখিলাম পর্ব্বতের নিম্নে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় মনুষ্য সব আসিতেছে। গোলাপ সিং আমায় ডাকিয়া বলিল, মাইজী হুঁসিয়ার হও। হামারা হাঁথ জোরসে পাকড়ো তুমারা সামনে ওহি বরফ কি পুল দেখাই যাতা। জিনকো ভিতর মন্দাকিনী চলতাহিঁ। উপর সে বরফ জমগেয়া। আমি বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিলাম সম্মুখে তুষারাচ্ছন্ন তুষারময় পুল, তাহার ভিতর দিয়া কল কল তানে মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইতেছেন। মন্দাকিনীর উপর বরফ জমিয়া সেতুর আকার হইয়া গিয়াছে। সেটা আধ মাইলের কম নয়। আমি গোলাপ সিংহের হাত ধরিয়া কেদারনাথকে স্মরণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। দশ মিনিট পরে ববফের পুলটা পার হইলাম। কিন্তু যতই অগ্রসর হইতেছি ততই বরফস্তুপ। অত্যধিক ঠাণ্ডায় যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। গোলাপ সিং আমার হাত ধরিয়া প্রায় এক মাইল আসিল। বরফের উপর দিয়া চলিতে বারম্বার আমার পদস্খলন হইতে লাগিল। বরফের পিচ্ছিলতায় বারবার পড়িতেছি আর উঠিতেছি। তবে এ স্থানটা তুষারাবৃত সমতল স্থান। পড়িলেও মরণের আশঙ্কা নাই। কিন্তু এইস্থানের কি রমণীয় দৃশ্য তাহা ভাষায় বর্ণনা করা আমার মত মূর্খা রমণীর অসাধ্য। যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি চতুর্দ্দিকেই শুভ্র তুষারময় ছবি।

হিমালয় পরিভ্রমণ

সুনীল আকাশমণ্ডল যেন হিমালয়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আমাদের মস্তকের উপর সীমাহীন অনন্ত আকাশ আর আমাদের চতুর্দ্দিক অসীম তুষার রাশিতে আচ্ছন্ন। ইহা যে স্বর্গধাম তাহার আর সন্দেহ নাই। উচ্চ কৈলাসশিখর হইতে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী প্রবল বেগে কৈলাসপথ দিয়া নামিয়া আসিতেছেন, তাহার তরঙ্গ-নিনাদ শুনা যাইতেছে।

কাহার সাধ্য যে এই মন্দাকিনীর প্রবল বেগ সহ্য করে। আবার সম্মুখে মন্দাকিনীর একটী সেতু, সেই সেতু পার হইয়া কেদার দর্শন করিতে হইবে। আমার পাণ্ডা বিশ্বনাথ সুকুল ও গোলাপ সিং দুইজনে আমার দুই হাত ধরিয়া পুলটি পার করিয়া দিলেন। এই সেতু হিমালয়ের উপরিভাগে। আমি যেন আত্মহারা হইয়া এই সব দৃশ্য দেখিতেছি। এখান হইতে আরও কিছু উচ্চে উঠিয়া প্রভু কেদারনাথের মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দর্শন হইল। এই স্থানকে দেবদেখনি স্থান বলে। এই বরফাচ্ছন্ন স্থানে চলিতে চলিতে জুতা মোজা সব ভিজিয়া জল হইয়া গেল। পদতল অসাড়, যেন মনে হইতেছে হাতের ও পায়ের তলায় শিঙ্গিমাছের কাঁটা ফুটাইয়া দিতেছে। হাত পা ঠাণ্ডায় সব নীলবর্ণ হইয়া গেল। শরীরের রক্ত সব জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এখনও এই স্থান হইতে কেদার নাথের মন্দির এক মাইল আছে। আর পা চলে না, গতিশক্তিও গেল। অনেক কষ্টে ঐ একমাইল পাণ্ডার ও গোলাপ সিংহের হাত ধরিয়া এই রাস্তাটুকু আসিলাম এবং পাণ্ডার নির্দ্দিষ্ট বাসায় উঠিলাম। বাসার অবস্থাও তদ্রূপ। এই তুষারধবল হিমালয় শৃঙ্গে ৮।১০ খানা কাঠের

ঘর ; তার মাথাটা তক্তাদেওয়া, গৃহের নিম্নতল বরফাচ্ছন্ন। গৃহের ছাদ তুষারাবৃত। অনেক কষ্টে পাণ্ডারা মধ্যতলটা বরফ কাটিয়া, পরিষ্কার করিয়া দ্বিতলের কক্ষগুলা চেটাই বিছাইয়া রাখিয়াছে। আর অবিচ্ছিন্ন ছাগপাল ও মেষপাল লইয়া মেষপালকগণ এই সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া ক্রমাগত হিমালয় শৃঙ্গে উঠিতেছে ও নামিতেছে। ভারবাহী ছাগপাল রাস্তা জুড়িয়া চলিতেছে। তাহার উপর পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ ছেলেপিলে লইয়া চলিয়াছে। আমাদের গৃহের ছাদগুলিতে গলিত তুষারের জলধারা পতিত হইতেছে। শীতে কম্পিত কলেবর, হস্ত পদ অবশ,—ঐ গৃহমধ্যে আশ্রয় লইলাম। গৌরবাবু ঐ পাণ্ডার বাটীতেই উঠিলেন। আধ ঘণ্টা বসিয়া একটু সামলাইয়া শ্রীকেদার প্রভুর পূজার উপকরণগুলি গুছাইয়া, সকলেই প্রভু কেদারনাথের মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পাণ্ডা ও বোঝাওয়ালা তিন জন ও কাণ্ডিওয়ালা তিনজন আমাদের রক্ষকরূপে চলিল। গৌরবাবু ও তাঁহার ভগ্নী চলিলেন। আমরা মন্দাকিনীর তটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু কাহার সাধ্য মন্দাকিনীর তুষার বারিতে স্নান করে! পাণ্ডা একঘটি মন্দাকিনীর পবিত্র বারি আনিলেন। আমরা মস্তকে তাহাই স্পর্শ করিলাম। তাহার পর পূজার উপকরণগুলি লইয়া, এক কমণ্ডলু মন্দাকিনী বারি ও কিস্‌মিস্‌, মিছরি, বাদাম, পেস্তা, ধূপ, ধুনা, কর্পূর, গব্যঘৃত, দীপ লইয়া প্রভুর মন্দিরে চলিলাম। আজ ছয়মাস কাল মন্দির বন্ধছিল আজ মাত্র খুলিয়াছে ; কাজেই এখনও স্তূপীকৃত বরফরাশি মন্দিরের দ্বারের নিম্নে পড়িয়া আছে। আজ ২২শে বৈশাখ, কেদারের কপাট খুলিল। কিন্তু মন্দিরের মাথা এখনও

তুষারাবৃত। গৌরবাবু আমাদের আগে আগে চলিলেন। পথে একটী পুলিশ ইন্‌সপেক্টর সহ ইহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ঐ ইন্‌সপেক্টর বড় ভদ্র, তিনি আমাদের কেদার দর্শনের যথেষ্ট সহায়তা করিলেন। আমরাও আমাদের প্রায় এক হাজার যাত্রীদল, জয় কেদার মহারাজ কি জয়, কৈলাস পতিকি জয়, বলিয়া মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলাম। গমন সময়ে বরফাচ্ছন্ন স্থান দিয়া গমন করিতে পিচ্ছিলতায় অনেকে পড়িয়া গেল। তাহার উপর যাত্রীর ভিড়। তবে এ স্থানটি বিস্তীর্ণ ও সমতল। মন্দাকিনী সেতুর কিছু দূরে সরস্বতী গঙ্গা কল কল ঝঙ্কারে মন্দাকিনী সহ মিলিতা হইতেছেন। ভগবান্ কেদারনাথের অধিষ্ঠান স্থানটী সরস্বতীও মন্দাকিনী দুইজনে দুইদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়াছেন। আমাদের পশ্চাতে বিপুল যাত্রীদল, জয় কেদার স্বামীর জয়, বলিয়া শৈলশিখর কম্পিত করিতেছে। গৌরবাবু আমাদের অগ্রবর্ত্তী—মন্দির দ্বারে দাঁড়াইলেন। দ্বার তখনও রুদ্ধ। সাধু সন্ন্যাসীদল প্রথমে তাঁহাকে পূজা করিবে, তাহার পর অন্যান্য যাত্রীগণ পূজা করিবে। আমাদের কাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালারা হস্তের দ্বারা শৃঙ্খল করিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং দুইজন পুলিশের কনষ্টেবল দাঁড়াইল। যাত্রীর ভিড় হইতে আমাদের বাঁচাইবার জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিল। আমরাও "প্রভু! দর্শন দাও" বলিয়া ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিতে লাগিলাম। ১৫।২০ মিনিট পরে ভিতর হইতে বৃহৎ লৌহময় কপাট খুলিল। পুলিশের লোক আমাদের বারজনকে লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। যদি পুলিশ-ইনসপেক্টর এতটা সাহায্য না করিতেন তবে আমাদের দর্শন সুলভ

হইত না। মারহাটি, পাঞ্জাবী, সিন্ধি যাত্রীদল, অগ্রে আমাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। মন্দিরের ভিতরে বরফ, মন্দির অভ্যন্তর পিচ্ছিল। পাণ্ডার হাত ধরিয়া মন্দির অভ্যন্তরে চলিলাম। আজ আমাদের জন্ম ও জীবন সফল হইল। আমি ধীরে ধীরে কম্পিত হৃদয়ে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম মন্দিরের মধ্যস্থলে বৃহৎ পাষাণময় বৃষভমূর্ত্তি। তাহার আর একটু উচ্চস্থানে ঘৃত দীপ প্রজ্বলিত রহিয়াছে। দীপ সম্মুখে ভগবান্ কেদারনাথের বিশাল পাষাণময় মূর্ত্তি। আমি ঘৃত দ্বারা তাঁহার গাত্র মার্জ্জন করিলাম ও মন্দাকিনী বারি ও বিল্বপত্র প্রদান করিয়া ধূপ, দীপ কর্পূর, গন্ধ, স্বর্ণ, রৌপ্য দিয়া যথাশক্তি অর্চ্চনা করিলাম। এবং ভক্তি বিহ্বল হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। প্রভু! আর যেন সংসারে আসিতে না হয়। ভগবানের নিকট নিষ্কাম হইয়া আসিতে হয়, কামনাবাসনার কালিমা যেন না থাকে। আজ ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী আশুতোষ কৃপা করিয়া পাতকীকে দর্শন দিলেন ভাবিয়া, দুই নয়নে আমার আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। আমি বারম্বার লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া মন্দিরের অন্যদিকে গিয়া, বিশ্বজননী গৌরীদেবীকে দর্শন করিলে, পাণ্ডারা আমাদের মন্দিরের বহির্ভাগে আনিলেন। আমরা বাহিরে আসিবামাত্র বিপুল জনতা সহ যাত্রীদল মন্দিরে প্রবেশ করিল। তাহাদের লাঠালাঠি মারামারি রক্ষা করা দুঃসাধ্য। তথাপি মাননীয় ডেপুটীকমিশনার মহোদয়ের সুশৃঙ্খলায় এক পথ দিয়া দর্শন করাইয়া অন্যপথ দিয়া বাহির করিয়া দিল। আমরা কাঁপিতে কাঁপিতে অবশ দেহে অসাড় হস্তপদ লইয়া

কোনক্রমে বাসায় আসিলাম। এখানে কাষ্ঠ মিলিল না যে অগ্নি জ্বালিয়া প্রাণ বাঁচাইব। আধঘণ্টা বাদে শরীরটা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে উঠিয়া বসিলাম। তখন বেলা ১২টা কিন্তু হিমালয়ের হিম-শীতল বাতাসে প্রাণ কণ্ঠাগত। আমাদের দর্শন করাইয়া গৌরবাবু পুনরায় মন্দিরে চলিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, পুলিশ একাকী পারিয়া উঠিতেছে না, আমিও যাত্রীদের দুই ঘণ্টা দর্শন করাইব। আমরা বিশ্বনাথ পাণ্ডাকে বলিলাম তবে আমাদের বিদায়ের ব্যবস্থা কর, কেন না রাত্রে এই হিমালয়শিখরে বিনা অগ্নিতে থাকা অসাধ্য। হিমে মরিয়া যাইব। সকলেরই তাহাতে মত হইল। পাণ্ডা আসিয়া আমাদের সুফল দিলেন। আমি বলিলাম ঠাকুর! ফলাকাঙ্ক্ষী আমি নহি। যাহা পারিব সাধ্যমত ব্রাহ্মণকে দান করিব। যথাশক্তি পাণ্ডাকে দিলাম। ইত্যবসরে আকাশে মেঘ দেখা দিল। কাণ্ডিওয়ালা বলিল, মাইজী জলদি উতরো বরফ গিরেগী। আমাদের প্রত্যেক যাত্রী পাণ্ডাকে ২৫৲ টাকা করিয়া দিলেন। আমার নিকট তিনি ৪০৲ টাকা লইলেন। আমরা পাণ্ডাকে কহিলাম, কেদার প্রভুর প্রসাদ ও নির্ম্মাল্য দিন। পাণ্ডা আমাদের আনিয়া দিলেন। প্রভু কৈলাসপতিকে বারম্বার প্রণাম করিয়া বাসার বাহিরে আসিলাম। যাইবার সময় মনের ব্যাকুলতায় ভাল করিয়া দেখা হয় নাই. আসিবার সময় হিমালয়ের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিলাম।

হিমালয় শৃঙ্গে দাড়াইয়া একবার চতুর্দ্দিক দেখিলাম। প্রকৃতির এমন মনোহারিণী মূর্ত্তি ত' জীবনে কখন দেখি নাই। এখানে বৈশাখের মধ্যাহ্নভাস্করও হিমে মলিন হইয়া আছেন, তাঁহার প্রখর

কিরণ নাই। আমরা মন্দাকিনীর তট দিয়া আবার নামিতেছি। উচ্চ পর্ব্বতশিখরে নির্ঝরধারা পতিত হইয়া মন্দাকিনীতে মিলিত হইতেছে। সম্মুখবর্ত্তী পথ তুষারাচ্ছন্ন ও চতুর্দ্দিক হইতে একটা শুভ্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে। এস্থানে একটীও কীটপতঙ্গ পক্ষীর সমাগম নাই। এ চির হিমানীমণ্ডিত হিমালয় যেন হিমমুকুট মস্তকে পরিয়া বসিয়াছেন। এস্থানে অসীমের সহ সসীমের মিলন। অনন্ত শুভ্র আকাশ আর শুভ্র আকাশচুম্বী হিমালয়, যেন উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়াছেন। এ রমণীয় দৃশ্য বর্ণনার ভাষা নাই, ভাব এখানে স্তব্ধ।

হিমগিরির সন্নিকটে আসিয়া যেন যক্ষের সেই অলকাপুরী বলিয়াই মনে হইল। ঠিক যেন কুবেরের অলকাপুরীর মতন শোভা সৌন্দর্য্য মনে হইল। বালসূর্য্যের কিরণ সম্পাতে হিমালয় শিখরের কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে। হিমগিরি যেন রজতগিরির ন্যায় হিরণ্ময় মুকুট পরিধান করিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই মহাকবির বাক্য স্মরণ হইল—

অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতং।
একোহি দোষোগুণ সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দু কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

এই হিমালয় অনন্ত রত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াও ভয়ানক অশনি-সমান হিমতুষারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন অলকাপুরীর ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। নব রবিকর কিরণে গিরিশৃঙ্গ যেন তুষার ভবনের শোভাময় হইয়াছে আর গিরিসানুদেশে ধবলশুভ্রলঘু মেঘখণ্ড

ভাসিয়া যাইতেছে। কত বিচিত্র বর্ণের মেঘ বিচিত্র ভঙ্গিতে নানা আকারে ক্রীড়া করিতেছে। একদা রামগিরির পাদমূলে বসিয়া বিরহী যক্ষ যে কুটজ কুসুম গিরিমল্লিকায় অর্ঘ সাজাইয়া মেঘকে দূতরূপে পত্নীর সংবাদ বাহক করিয়া পাঠাইয়া ছিল তাহা বিচিত্র নহে। এস্থানে মেঘের সৌন্দর্য্য শোভা দেখিলে মহাকবির বর্ণনার সার্থকতা অনুভূতি হইয়া থাকে। এও মনে হইল এ সেই অলকাপুরী —তবে বিরহ বিধুরা যক্ষ পত্নীর সন্ধানটা লওয়া হইল না। এ হিমরাজ্যে এত ফুল এত সুন্দর শোভা কখন কল্পনাও করি নাই। রামবারির পথটা যেন ফুলে ফুলময়। কে যেন সারি সারি পুষ্পগুচ্ছ সাজাইয়া রাখিয়াছে। এখানে প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য। উন্মুক্ত আকাশ আর মুক্ত বাতাসে কি হিমবাণ বিচ্ছুরিত হইতেছে। নগাধিরাজ হিমালয় যেন পরমা প্রকৃতি পার্ব্বতীর অঙ্গে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছেন। আমি বিস্ময় বিহ্বল নয়নে ক্ষণকাল মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলাম। কি তুষারময়ী ছবি! প্রকৃতি সুন্দরী যেন মূর্ত্তিময়ী হইয়া তুষার বসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়াছেন। আমার স্নেহ-ভাজন পুত্র গৌর বলিলেন মা দেখুন কি মহান্ দৃশ্য। আমি নিমেষ হীন নয়নে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম মনে হইল একি স্বপ্নরাজ্য। তারপর ভাবিলাম এ যে দেবভূমি, নতুবা মরজগতের এত সৌন্দর্য্য শোভা ত কখন দেখি নাই। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম গৌর এ দেব-লোকই বটে এমন সুন্দর শোভা কখন দেখি নাই। এই জনমানব পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ হীন স্থান যেন স্বর্গীয় দিপ্তিতে উদ্ভাবিত হইতেছে —এ সৌন্দর্য্য বর্ণনে আমার লেখনী অক্ষম।

আমরা হিমালয়ের সেই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমেই নামিয়া আসিলাম। আবার সেই বরফস্তূপ ভাঙ্গিয়া, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে হিমালয়ের পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। ভূর্জ্জপত্রের শত শত বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। এবং স্থানে স্থানে রুদ্রাক্ষের গাছও দেখিলাম। আমরা নামিয়া আসার একঘণ্টা পরে গৌরবাবু আসিলেন। তিনি আসিলে আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলাম, "বাবা! তোমারি কল্যাণে আমার কেদারনাথ দর্শন।" গৌরবাবু আমায় প্রণাম করিয়া বলিলেন "মা! আপনাদের আশীর্ব্বাদে এই ক্ষীণ বাহুর বলে আজ দুই শত নিঃসহায় দীন দুঃখী যাত্রীদের কেদার দর্শন করাইয়াছি। যাহাদের অর্থ আছে পাণ্ডারা সেই যাত্রীদের যত্ন করিয়া লইয়া গিয়া দর্শন করায়; কিন্তু অসহায় নিঃস্ব যাত্রীদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না। তাই আজ প্রাণ ভরিয়া গরীব দুঃখী যাত্রীদের দর্শন করাইয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।" আমরা গৌরবাবুর এই সৎকার্য্যের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম। কিন্তু এই যাত্রীদলকে ভিড় ঠেলিয়া দেখাইতে গিয়া দুই দিন হাতের বেদনায় তিনি হাত নাড়িতে পারেন নাই। আমরা তিন ঘণ্টা বাদে গৌরীকুণ্ড চটী হইয়া রামবাড়ী চটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন রাত্রি ৭টা। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রে বাসায় আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মুগের ডাল ভাতে দিয়া দুটী অন্ন আহার করিলাম। রাত্রে শয়ন মাত্রেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। প্রাতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া যাত্রীদল 'জয় বদরী বিশালকে

জয়' ! বলিয়া সকলেই পথে বাহির হইলেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। এই স্থান হইতে দুইটী পথ দুই দিকে গিয়াছে—একটী কেদারনাথের রাস্তা, একটী বদরীনাথের রাস্তা। আমরা বেলা ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া পুনরায় রামপুর চটী আসিলাম। আজ এই স্থানেই স্নান পূজা সমাপ্ত করিয়া অন্নাদি পাক করিয়া আহার করা গেল। কাণ্ডিওয়ালারাও নিজ নিজ আহার্য্য রুটী প্রস্তুত করিয়া ভোজন সমাধা করিল। আবার আহারের পর মোটঘাট বাঁধিয়া সকলেই চলিতে লাগিলাম। আমি কতক পথ হাটিতাম, কতক পথ ডাণ্ডিতে যাইতাম। কয়েক চটী পার হইয়া বেবঙ্গ চটী আসিলাম। রাত্রে এই স্থানে থাকা স্থির হইল। সন্ধ্যা-বন্দনা করিয়া হালুয়া রুটী আহার করা গেল। এস্থানটি বড় সুন্দর—ঝির ঝির করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে, দুচারিটা গাছপালাও আছে। চটীর নিম্নেই নদী আছে। আবার ভোরে উঠিয়া 'বদরী বিশাল' বলিয়া যাত্রা করা গেল। এবার আমরা পরমধাম বিষ্ণুলোকে যাইতেছি, আনন্দ আর ধরে না। তিন মাইল আসিরা ফাটা চটী নামে এক চটীতে আসিলাম। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া আবার চলিলাম। তাহার পর দুই মাইল উৎরাই আসিয়া মন্দাকিনীর পুল পার হইয়া আবার চড়াই পথে দুই মাইল আসিয়া কালীমঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই মঠের মধ্যে কালীমাতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। কালীমাতাকে প্রণাম করিয়া আবার চড়াই পথে উঠিয়া দু মাইল উৎরাই পথ গিয়া ওখীমঠে আসিলাম। ওখীমঠ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। মঠটী খুব বৃহৎ এবং অতি সুন্দর। প্রকাণ্ড সিংহ দ্বার। এখানে ভগবান্ কেদারনাথ ও তুঙ্গনাথ ও

বদরীনাথের স্বর্ণমণ্ডিত মূর্ত্তি আছে ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে এবং ভগবান্ কেদারনাথের একটী লিঙ্গমূর্ত্তিও আছে এবং কেদারনাথের পাণ্ডার গদী আছে। আশ্বিন মাস হইতে তুষারপাত আরম্ভ হইলে, চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ছয়মাসকাল এই স্থানেই ভগবান্ কেদারনাথের ভোগ পূজা আরতি সমস্তই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই স্থানে একটী কুণ্ড আছে; সেই কুণ্ডের জলেই ভগবানের পূজা ভোগাদি সম্পন্ন হয়। যাত্রীরা ঐ কুণ্ড হইতে জল তুলিয়া স্নান ভোজন পানাদি করিয়া থাকে। মঠটী বেশ। মঠের দুই পার্শ্বে দোকান ও ধর্ম্মশালা। এই মঠে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছেন। আমরা মঠে ভগবান্ কেদারনাথ, বদরীনাথ ও তুঙ্গনাথের স্বর্ণমুকুটশোভিত সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া, পূজাদি দিয়া বাসায় আসিয়া রন্ধনাদি করিয়া আহার করিলাম। বৈকালে আবার পথ হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা সংক্রান্তির দিন বদরীবিশাল দর্শন করিব, ইহাই আমাদের মনের একান্ত অভিলাষ। সংক্রান্তির মোটে আর ৮।৯ দিন বাকি আছে, এজন্য আমরা প্রত্যহ দুইবেলা ২০ মাইল ২২ মাইল চলিতেছি। আমরা নানাদেশ, নানা জাতি, নানা ভাষা ও নদনদী গিরি নির্ঝরিণী যতই দেখিতেছি ততই আমাদের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। প্রত্যহই এক একটী নূতন স্থান দেখিতেছি, আর প্রকৃতিদেবীর নগ্ন সৌন্দর্য্যে চক্ষু ভরিয়া যাইতেছে। দেশ ভ্রমণের যে কি আনন্দ, কি সুখ তাহা বলিবার নয়। যাহারা কখন দেশ ভ্রমণ করেন নাই তাঁহারা এই সুখের আস্বাদ জানেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা চৌপাতা চটী আসিয়া পৌছিলাম। গোলাপ

সিং বলিল, "মাইজী কাল ভোর ভোর চলো, ৯ মাইল চড়াই উঠেগি।" এই চৌপাতা চটীর চলিত নাম চোপ্তা। এই স্থানের নিকটস্থ গ্রামে ভগবান্ তুঙ্গনাথ আছেন, কাল তাঁহার শোভা-যাত্রা হইবে। তুঙ্গনাথ দেব এই স্থান হইতে তুঙ্গনাথ পাহাড়ে যাত্রা করিবেন। বদরী কেদারের ন্যায় তিনিও ছয়মাস কাল পাহাড়েই থাকিবেন, সেই স্থানেই তাঁহার পূজা ভোগ রাগ হইবে। আমরা তুঙ্গনাথ প্রভুর দর্শন আশায় আজ চৌপাতা চটীতেই রহিলাম। এই স্থান হইতে তুঙ্গনাথের পাহাড় ৭ মাইল চড়াই। সে পাহাড়টীও বরফাবৃত। প্রাতে আমরা তুঙ্গনাথের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য রাস্তার ধারে আসিলাম। বেলা ৭টার সময় নিকটস্থ গ্রাম হইতে শোভাযাত্রা করিয়া বাদ্য নিশান ধ্বজ পতাকা সুসজ্জিত হস্তী অশ্বসহ পাণ্ডাগণ তুঙ্গনাথ প্রভুকে লইয়া এই স্থানের একটী মন্দিরে স্থাপন করিলেন। আমরা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম এবং প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া 'জয় বদরীবিশাল' ব'লিয়া বাহির হইলাম। এই স্থান হইতে জঙ্গল পথ আরম্ভ। ক্রমেই আমরা গভীর অরণ্যভূমে আসিয়া পড়িলাম। একে এই বিজন বনভূমি, তাহার উপর চড়াই পথ। ঘন সন্নিবিষ্ট মহীরুহ ও বৃহৎ বৃহৎ বন্য পাদপ সকল আকাশস্পর্শী হইয়া বনভূমি অন্ধকার করিয়া আছে। জনমানবের চিহ্ন-বর্জ্জিত এই নিবিড় বনে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না। যেরূপ বিশাল বনভূমি তাহার মধ্যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ—তাহাতে পথ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছে—বুঝি বাঘ ভল্লুক এখনি আসিবে। কেবল বৃক্ষশাখায় বসিয়া পক্ষীকুল আনন্দে গান করিতেছে

এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষীণা নির্ঝরিণী কুলু কুলু তানে বহিয়া যাইতেছে। গোলাপ সিং বলিল 'মাই এহি গন্ধমাদন পাহাড় হোয়। এই জঙ্গলমে বহুত সের ভালুক হাতী হ্যায়'। আমি মনে মনে বলিলাম ঠাকুর রক্ষা কর। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সের ভালুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে মধ্যে মধ্যে দু একটা নীল গাই ও শৃগালজাতীয় জন্তুর দেখা পাইয়াছিলাম। গৃহে বা অরণ্যে যিনি আমাদের চিরদিনের রক্ষক, তিনিই এই বিজন বনপথে আমাদের রক্ষক রূপে চলিতেছেন। যিনি ভয়েরও ভয়, মৃত্যুরও মৃত্যু, তিনিই আমাদের চিরসাথী। ডাণ্ডিওয়ালারা অতি সাবধানে ধীরে ধীরে চলিতেছে। আমাদের সঙ্গে অনেক যাত্রীও চলিতেছে। বেলা ৭টা হইতে চলিয়া বেলা ১২টার সময় আমরা জঙ্গল চটী নামক একটা চটীতে আসিলাম। বাহকগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। এই স্থানে দুখানি দোকান ও একটী জলের ঝরণা আছে। যাত্রীদল সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল; সকলেই আহারের জোগাড়ে গেল। আমরাও একটু বিশ্রাম করিয়া স্নানাদি করিয়া অন্নপাক করিতে বসিলাম।

আমরা ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত সকল ঠেলিয়া এই সুদীর্ঘ পথে চলিয়াছি, কবে যে লক্ষ্যস্থলে পৌছাইব জানি না। আমি প্রত্যহ আদপোয়া চাউল, আদপোয়া আটা খাইতাম ও দেড় ছটাক ঘি খাইতাম। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই রক্ত আমাশয় রোগে ভুগিতেছে। পাছে রক্ত আমাশয় রোগ হয়, এজন্য আমরা প্রত্যহ ঈশগুল ও মিছরি ভিজাইয়া খাইতাম। পাণ্ডারা বলিতেন এ পাহাড়ের পথে অধিক পরিমাণে ঘৃতই সুপথ্য। বৈকালে আমরা ৪ মাইল হাঁটিয়া একটী

চটীতে আসিলাম। ইহার নাম মণ্ডন চটী; রাত্রে এই স্থানে থাকা গেল।

আবার ঊষার কিরণ ফুটিতে ফুটিতেই আমরা 'বদরীবিশাল' বলিয়া যাত্রা করিলাম। এ স্থানটী কি সুন্দর! সম্মুখে পাহাড়, পাহাড়ের নীচে বিস্তৃত মণ্ডনগঙ্গা ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হইতেছে। আমরা গঙ্গার ধারে ধারে চলিতেছি। গঙ্গার জল স্থানে স্থানে শুকাইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে স্বচ্ছ শীতল জল প্রভাত পবনে নৃত্য করিতেছে। এস্থানের রাস্তাটীও বড় মনোহর। ২।৩ মাইল গিয়া একটী চটীতে বসিলাম; একটু বিশ্রাম করিয়া আবার সকলেই চলিলেন। দু মাইল পরে বৈতরণী গঙ্গায় আসিলাম। বৈতরণীর জল মাথায় দিয়া আবার চলিলাম। রাস্তা হাঁটিতে আমার খুব আনন্দ বোধ হইত। দেখিতাম প্রত্যহই প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য ও নব শোভা। যে দিকে চাই দেখি—সুন্দর গিরিশৈলমালা ও লতাগুল্মপাদপের নয়নাভিরাম ছবি, আর মধুর পক্ষী কাকলী, আর হিমশীতল সমীরণ বনকুসুমের সৌরভ ঢালিয়া দিতেছে। এই স্থান বাস্তবিকই স্বর্গপথ—এখানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, দ্বন্দ্ব নাই। এখানে জীবের কেমন শুদ্ধসত্ত্ব, নির্ম্মল ভাব, সকলেই একলক্ষ্যে ভগবানের দিকে ছুটিয়াছে, বিশ্বের প্রতি বস্তুতেই যেন বিশ্বময়ের ছবি ফুটিয়া রহিয়াছে। তাই এই স্থানের নাম সত্যপথ। আমাদের মাথার উপর সুনীল অনন্ত আকাশ, আর চতুর্দ্দিকে শৈলশিখর। যেন অফুরন্ত সৌন্দর্য্য। স্বভাবের কি মনোমোহিণী ছবি! তাহার পর ভীম চটী আসিলাম, সেখান হইতে ২॥ মাইল পথ আসিয়া পঙ্গরবাসা চটী। এইখান হইতে বিজন বনপথ।

এই স্থান হইতে চতুর্থ কেদারনাথের দর্শনের জন্য বনমধ্যে উচ্চ চড়াই পথ আছে। এই পথে যাইতে অনসূয়া দেবীর মন্দির আছে। এই মন্দির হইতে ৪০ মাইল যাইলে উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর চতুর্থ কেদার রুদ্রেশ্বর দর্শন হইয়া থাকে। আমরা অতদূর আর যাইতে সাহস করিলাম না। সেই স্থান হইতে ৪ মাইল আসিয়া সিজ্ঘেনা চটী আসিলাম। তাহার পর গোপেশ্বরের পথে চলিলাম। এই স্থানে বানখিন্ননদী প্রবাহিতা হইতেছেন। আমরা বৈতরণী গঙ্গার ৭ মাইল পরে আসিয়া গোপেশ্বর প্রভুর সুন্দর মন্দির দর্শন করিলাম। এই মন্দিরটী খুব উচ্চ। সম্মুখে অষ্টধাতু নির্ম্মিত একটী ত্রিশূল আছে এবং রাম লক্ষণ ও অন্য অন্য দেব দেবীরও মূর্ত্তি আছে। এখানে তিন চারিখানি দোকান ও সুমিষ্ট ঝরণার জল আছে। এখান হইতে তিন মাইল উৎরাই রাস্তা গিয়া আমরা লানসাঙ্গা চটী আসিয়া পৌছিলাম। ইহার আর একটী নাম চামৌলি। অলকনন্দার উপর লৌহ সেতু পার হইয়া লানসাঙ্গার বাজারে উঠিতে হয়; এস্থানটী সহরের মত। এখানে কাছারি, পোঃ আফিস, হাস পাতাল সবই আছে। পাহাড়ের উপর ছোট গ্রামগুলি কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। এখন হইতে ৺বদরীনারায়ণ ৪৭ মাইল। আমরা লানসাঙ্গার ধর্ম্মশালায় উঠিয়া মোটঘাট ফেলিয়া অলকনন্দার জলে স্নান করিলাম ও বাজার হইতে চাল ডাল আলু আনিয়া পাক করিলাম। স্নান পূজা আহার শেষ হইলে কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। পাহাড়ি লোকেরা বেশ সরল শান্ত স্বভাব। লানসাঙ্গা হইতে হিমালয়ের শিখর দর্শন হইতেছে। লানসাঙ্গা হইতে দুই

মাইল আসিয়া আমরা একটী উচ্চ চড়াই পথে খানিকটা আসিয়া মঠ চটী পৌঁছিলাম। এ চটীটি ভাল, ২।৪ খানি দোকানও আছে। রাত্রে এই স্থানেই থাকা স্থির হইল। সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া আমি প্রত্যহ এই ডাইরি লিখিতাম, পরে আহার করিয়া শয়ন করিতাম। আজও তাহাই করিলাম। রাত্রে সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। আবার প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া সকলেই 'জয় বদরী বিশাল' বলিয়া বাহির হওয়া গেল। মঠ চটী হইতে দুই মাইল আসিয়া বাবলা চটী আসিলাম। তাহার পর ডাণ্ডিতে উঠিয়া আবার ৩।৪ মাইল আসিয়া সিরাহাট নামক চটীতে আসা গেল। তাহার পর আবার অলকনন্দা পার হইয়া পিপুলকোটী নামক চটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এবেলা এইস্থানে থাকা হইল ; একটী দোতলা বাসা লওয়া গেল। এস্থানটি ভাল, অনেক গরম কাপড়ের দোকান, কম্বলের দোকান আছে। শুনিলাম এখানে নানাবিধ পার্ব্বত্য ঔষধ, শিলাজতু, মৃগনাভি প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমরা পিপুল-কোটী আসিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিছু কিছু কিনিলাম। এখানে খুব ভাল কুমড়া বড়ি পাওয়া গেল, কিছু বড়ি ও আলু কিনিলাম। কিন্তু এখানে পাহাড়ী মাছির উপদ্রব খুব বেশী। আমরা রাত্রে এই স্থানেই রহিলাম। রাত্রে দোকান হইতে খাবার আনাইয়া আহার করা গেল। সুন্দর জ্যোৎস্নাফুল্ল রজনী। শুক্লাসপ্তমীর শশী আকাশ পটে উদিত হইয়াছেন—প্রকৃতি যেন হাস্য করিতেছেন। রাত্রি এই স্থানেই কাটান হইল। সমস্ত দিনের ক্লান্ত দেহ, শয়ন মাত্রেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম। এখানে পথের মধ্যে, জঙ্গলের

মধ্যে ধূলি শয্যায় যেরূপ গাঢ় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতাম, বোধ হয় স্বদেশের অট্টালিকায় দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া ওরূপ নিদ্রাসুখ উপভোগ করি নাই। তাহাতেই মনে হয় ক্ষুধার্ত্তের পক্ষে পঞ্চব্যঞ্জন অন্ন যেরূপ তৃপ্তিকর, শাক অন্নও সেইরূপই তৃপ্তিকর। নিদ্রার পক্ষেও তাই। পথশ্রান্ত ক্লান্ত দেহের পক্ষে মহার্ঘ্য শয্যা ও ধূলি শয্যা উভয়ই সমান। গৃহে একদিনও বিছানা মশারি ভিন্ন নিদ্রা হইত না, কত দিন অনিদ্রায় উদ্বেগেও রাত্রি কাটাইতাম। এখানে এই নিবিড় জঙ্গলপূর্ণ চটির মধ্যে দুইখানি কম্বল মাত্র সহায় করিয়া কি সুখেই নিদ্রা যাইতেছি! এখানে স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, কিন্তু যিনি তোমার চিরদিনের সঙ্গী তিনি ত আছেন। যতদিন না জীবের ভগবানের উপর ঐকান্তিক নির্ভর হয়, ততদিন জীব ভগবান্ হইতে অনেক দূরে থাকে। কিন্তু তাঁহার প্রতি অনুরাগ হইলে, দৃঢ় বিশ্বাস হইলে, জীবের আর কোন ভয় উদ্বেগ থাকে না। রাত্রি প্রভাতেই আবার 'জয় বদরীবিশাল' বলিয়া সকলেই চটী হইতে বাহির হইলাম। গৃহের কথা, পুত্র কন্যার কথা, সব ভুলিয়া গিয়াছি, হৃদয় ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাত্রিদিন তাঁহারি উদ্দেশ্যে ছুটিতেছি। কাল আমরা গরুড় গঙ্গা যাইব স্থির করিয়াছি। প্রাতে ৪ মাইল হাঁটিয়া আমরা বেলা ৯॥০ টার সময় গরুড় গঙ্গা আসিলাম। চটী যাইবার পথে নির্ঝরের জলধারা ঝরঝর রবে পতিত হইয়া পথটী কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। গরুড় গঙ্গার ঘাটের উপর একটী সুন্দর মন্দিরমধ্যে গরুড় মহারাজ অবস্থান করিতেছেন। মূর্ত্তিটী বড় সুন্দর। বিষ্ণু ভগবানের বাহন গরুড় দেব অমিত বলশালী। তাই

তাঁহাকে পূজা করিয়া শক্তিবল লাভ করিতে হয়। এখানকার চটীটি মন্দ নয়, ৪।৫ খানা দোকান আছে। পুরি ও মিষ্টান্ন বিক্রয় হইতেছে। চটীর নিম্ন দেশেই গরুড় গঙ্গা আসিয়া অলকনন্দার সহ মিলিত হইয়াছেন। আমরা চটীতে আসিয়া মোট গাঁটরী নামাইয়া গরুড় গঙ্গায় স্নান করিতে গেলাম। ব্রাহ্মণ আসিয়া সংকল্প করাইলেন। এখানে একটী প্রবাদ আছে যে এই গরুড় গঙ্গায় ভগবান্ গরুড়ের মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদিয়া বামহস্তে যে প্রস্তর খণ্ড তুলিবে ঐ প্রস্তরখানি শ্রীবদরী নারায়ণের গরুড় শিলায় স্পর্শ করাইলে, তাহাতে সর্পাদির বিষ নিশ্চয় নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকেই বিষপাতর বলে। এই প্রস্তর গৃহে রাখিয়া সর্প বা বৃশ্চিকের বিষে ঘর্ষণ করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ নষ্ট করে। আমিও চক্ষু মুদিয়া গরুড় গঙ্গায় ডুব দিয়া দুই চারিটা নুড়ি তুলিলাম। স্নানান্তে নিত্য পূজা সমাপনান্তে গরুড় মহারাজের দর্শন করিয়া পাকাদি করিয়া আহার করা গেল। আহারের দুই ঘণ্টা পরেই যাত্রীদল কোমর বাঁধিয়া 'জয় বদরীবিশাল কি জয়' বলিয়া বাহির হইল, আমরাও বাহির হইলাম। শ্রীভগবানের নামের অতুল মহিমা! সেই নাম-শক্তির বলেই শক্তিমান্ হইয়া আমরা সুদূর হিমালয় পথে চলিতেছি। তাই বৈষ্ণব সাধুগণ বলিয়াছেন—

'নাম নামী ভিন্ন নহে, বেদাগমে ভাষে।' এই নামশক্তির যে অপূর্ব্ব মহিমা তাহা এখন বেশ বুঝিতেছি। সাধক বলিয়াছেন কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণনাম আরও বড়; নামের গুণে পাপতাপ মলিনতা দূর করে। আবার নাম জপে তন্ময় হইলে জগতের সকলই তুচ্ছ বোধ

হয়। নামে জরা মৃত্যু পালায়, ভবব্যাধিরও নাশ হয়। তাই আজ প্রভু! তোমার নাম সম্বল করিয়াই বাহির হইয়াছি।

কিছুক্ষণ পরেই দুর্গম চড়াই আসিল। আমরা ৩॥ মাইল চড়াই হাঁটিয়া পাতাল গঙ্গায় আসিলাম। এখানে একবারে পাহাড়ের নিম্ন দিয়া অদৃশ্য ভাবে গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। এখান হইতে আমরা দুই মাইল আসিয়া গোলাপচটী নামক চটীতে আসিয়া বিশ্রাম করিলাম। তখন সন্ধ্যা প্রায় আগত। জ্যোৎস্নাফুল্ল ধরণী হাসিতে-ছেন, শীতল সন্ধ্যা সমীরণে লতাপত্র দোলাইয়া দিতেছে। পাহাড়ীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাগুলি আনন্দে স্ব স্ব গৃহে খেলা করিতেছে। আমরা এই চটীতেই আজ রাত্রে বাসা লইলাম। চটীওয়ালার নিকট ঘি ময়দা লইয়া রুটী তরকারি করা গেল। রাত্রে সুখে নিদ্রা গেলাম। আবার ভোরে উঠিয়াই ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া 'জয় বদরীবিশাল লাল কি জয়' বলিয়া যাত্রীদল উচ্চকণ্ঠে প্রভুর জয়গান গাহিয়া সকলেই চলিল। সকলেই পথের কষ্ট, শ্রান্তি, ক্লান্তি ভুলিয়া একলক্ষ্যে তাঁহার দিকে ছুটিতেছে। এই পথে আবার ভীষণ চড়াই —একবারে খাড়া চড়াইয়ের উপর দিয়া রাস্তা। এত উচ্চে উঠিতে হইতেছে যে নীচের দিকে চাহিলেই মাথা ঘুরিয়া যায়। সেইজন্য আমি অনেক সময়ে কাণ্ডিতে চক্ষু মুদিয়া শ্রীভগবানের চিন্তা করিতাম। আবার এই অত্যুঙ্গ পার্ব্বত্য পথের উপর গিরিশ্রেণী উর্দ্ধভাগে উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী তৃণলতাগুল্মশূন্য— একবারে ভীমাকৃতি উলঙ্গ দানবের মত অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আবার পর্ব্বত গাত্রে স্থানে স্থানে কি সুন্দররেখাযুক্ত প্রস্তর খণ্ড সকল

শোভা পাইতেছে। ভগবানের এই সৃষ্টি নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা আজ প্রাতে ৮ মাইল আসিয়া কুমার চটী পৌঁছিলাম। ইহার আর একটী নাম হেলঙ্গ। এখানে ৪।৫ খানা দোকান আছে। জলের ঝরণা আছে। আমরা কুমার চটীতেই ঐ বেলা থাকিয়া স্নান আহার সম্পন্ন করিলাম। এই কুমার চটী হইতে বাঁ হাতি রাস্তা নীচে দিকে নামিয়া অলকনন্দার সহ মিলিয়াছে। ঐ স্থানে পারের জন্য দড়ির ঝুলা আছে। ঝোলার উপর দিয়া অলকনন্দা পার হইয়া পরপারের পর্ব্বতের উপর নিবিড় বনমধ্যে পঞ্চম কেদার বালেশ্বর মহাদেব আছেন। পাণ্ডা বলিলেন ইনি পঞ্চম কেদার নামে অভিহিত। আমরা আহারাদি করিয়া বিশ্রামান্তে আবার হাঁটিতে লাগিলাম। কুমার চটী হইতে ২॥ মাইল আসিয়া থনোটী চটী আসিলাম। এই স্থান হইতে পর্ব্বত গাত্রে একটী সঙ্কীর্ণ রাস্তা উঠিয়াছে। ঐ পথ দিয়া গমন করিয়া পঞ্চ বদরীর অন্যতম বদরীতে উপস্থিত হওয়া যায়। পঞ্চ কেদারনাথের ন্যায় পাঁচটী বদরীনাথও আছেন। প্রথম বদরীনারায়ণ বা শুদ্ধ বদরী, দ্বিতীয় পাণ্ডুকেশ্বর বা যোগ বদরী, তৃতীয় যোশীমঠে নৃসিংহ বদরী। কুমার চটীর পথ দিয়া চতুর্থ বদরী যাইতে হয়। পঞ্চম আদি বদরী বা ভবিষ্য বদরী মেনচৌরির রাস্তার পথে আছে। পাণ্ডা বলিলেন জোশীমঠ হইতে নীতিপাশের রাস্তায় তাঁহার দর্শন হয়। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম যখন কলির চরম সীমা হইবে তখন নরনারায়ণ পর্ব্বতদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন হইয়া বদরী গমনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। যা হোক আমরা মনোটি চটী হইতে শ্যামা চটী আসিয়া ঐ স্থানেই রাত্রি বাস

স্থির করিলাম। কাল প্রাতে আমরা জোশীমঠ যাইব স্থির হইল। প্রাতে উঠিয়াই বদরীবিশালকে স্মরণ করিয়া যাত্রী সব চলিতে লাগিলেন ; আমরাও চলিলাম। গৌরবাবু ও তাঁহার ভগ্নী আমাদের অনেক পূর্ব্বেই জোশীমঠ গিয়া পৌছিয়াছেন, আমরা কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছি। এই পথে খাড়া চড়াই, একবারে খাড়া চড়াইয়ের উপর সড়ক রাস্তা। আমরা পথের কষ্ট শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলিয়া শ্রীভগবানের দিকে এক লক্ষ্যই চলিতেছি। এখান হইতে জোশীমঠ তিন মাইল। মঠটি পাহাড়ের উপর। অনেক কষ্টে কাণ্ডিওয়ালারা আমাদের যোশীমঠে পৌছাইয়া দিল। আমরা মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের সেই পরম পবিত্র জোশীমঠ দর্শনে ধন্য হইলাম। জোশীমঠ ভারতের একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানেই ভগবান্ শ্রীবদরীনারায়ণের ছয় মাস কাল পূজাপাঠ ভোগরাগ আরতি হইয়া থাকে। এখানে অনেক সাধু মহাত্মা আছেন। জোশীমঠের কিছু দূরে জ্যোতিশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। শ্রীভগবান্ বদরীনারায়ণের কোষাগারও এই স্থানে আছে। এখানে নৃসিংহদেব, বাসুদেব ও দুর্গাদেবী প্রভৃতির মন্দির আছে। আমরা মোটঘাট রাখিয়া শ্রীভগবানের দর্শনার্থে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সুন্দর মন্দির, তাহার মধ্যে ঘৃতদীপ জ্বলিতেছে। মন্দিরের ভিতরে বেদীর উপর রত্নসিংহাসনে নৃসিংহ বদরীনাথ অবস্থান করিতেছেন। পুরোহিত আমাদের যত্ন করিয়া দেখাইলেন, আমরা প্রণাম করিয়া বাসায় আসিলাম। আবার সন্ধ্যাকালে আরতির সময় গিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া আসিলাম। বিগ্রহ মূর্ত্তিটী চমৎকার, যেন হাসিতেছেন। আমরা আরতি দর্শন করিয়া

বড়ই আনন্দিত হইলাম এবং শ্রীভগবানের চরণে বারম্বার লুণ্ঠিত মস্তকে প্রণাম করিয়া পূজারিকে দক্ষিণা দিয়া বাসায় আসিলাম। মন্দিরের বামপার্শ্বে গরুড় মহারাজের মূর্ত্তি আছে, তাহার পার্শ্বে বিষ্ণু মন্দির। অন্যান্য দেবদেবীরও মন্দির আছে। এস্থানে দশ বার থানা দোকান আছে, গরম কাপড় কম্বলের দোকান অনেক আছে। রাস্তায় দুই পার্শ্বেই দোকানের সারি, শুনিলাম এখানে উৎকৃষ্ট শিলাজতু, মৃগনাভি, চামর, পর্ব্বতজাত ঔষধ ও গরম কাপড় পাওয়া যায়। প্রভু বদরী নারায়ণের পূজারী রাওল সাহেব ছয় মাসকাল এই স্থানে বাস করেন। জশীমঠে এখনও নাকি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের স্বহস্ত লিখিত পুথি সকল বিদ্যমান আছে। মঠের সম্মুখে একখানি বড় দোকান। আমি ঐ দোকানে গিয়া দশ টাকার একখানি নোট ভাঙ্গাইয়া একখানি বদরীনাথ মাহাত্ম্য পুস্তক এক টাকায় কিনিলাম এবং ভগবান্ বদরী-নাথের প্রতিমূর্ত্তি ছয় আনায় লইলাম। দোকানস্বামী বড় ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলাম। আমার লাঠি গাছটি দোকানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। আবার যখন লাঠি আনিতে গেলাম, দেখিলাম তিনি আমার লাঠি গাছটি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছেন, আমি চাহিবামাত্র বিনীত ভাবে প্রত্যর্পণ করিলেন। মুদির দোকান হইতে আলু, ঘি, আটা, লইয়া পুরি ভাজিয়া আহার করিলাম। আজ রাত্রি আমরা জোশীমঠেই বাস করিব।

যোশীমঠে দণ্ডধারায় স্নান করিতে হয়। এখানে ঝরণার জল অতি সুস্লিষ্ট। পোঃ অফিস, টেলিগ্রাম অফিস, হাঁসপাতাল, থানা সমস্তই এখানে আছে। এখানে চাল, ডাল, আলু, ঘি, দুধ, সবই

পাওয়া যায়। এখান হইতে বদরীনারায়ণ ২০ মাইল। শুনিলাম যাঁহারা মানস সরোবর গমন করেন, তাঁহাদের এই যোশীমঠ হইতেই অন্য একটী পথ ধরিয়া যাইতে হয়। এখান হইতে একটী সরকারি রাস্তা বরাবর নীতিপাশের পথে গিয়াছে। ঐ স্থান এখান হইতে ৪৫ মাইল। ঐ পথে আরও ৮।১০ মাইল গমন করিলে ভবিষ্যবদরী দর্শন হয়। শুনিলাম ঐ নীতিপাশই ভারতের শেষসীমা ও তিব্বতের প্রারম্ভ। বনে বনে সাধু সন্ন্যাসী আষাঢ় মাসের শেষে এই পথে গমন করিয়া আরও ২০।২৫ দিন হাঁটিয়া সৌভাগ্যক্রমে মানস সরোবরে পৌছিয়া থাকেন। এই পথ আষাঢ় মাসে গমনের উপযুক্ত হয়। বরফ গলিয়া রাস্তা বাহির হয়। কিন্তু এ পথে মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য বা বাসস্থান কিছুই নাই। কাজেই এ স্থান মানুষের অগম্য। তাহার উপর নিরবছিন্ন তুষারপাত হইয়া ঐ স্থানে নাকি অপূর্ব্ব শুভ্র ধবল-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া আছে। বদরীবিশালের উত্তরে কলাপগ্রামে নাকি এখনও ভারতের পুণ্যময় ঋষিসমাজ বর্ত্তমান আছেন। আমরা একরাত্রি যোশীমঠে বাস করিয়া পর দিন প্রাতে বিষ্ণুপ্রয়াগ চলিলাম। এখান হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ খাড়া উৎরাই। বহু কষ্টে ধীরে ধীরে সংযত হইয়া নামিতে লাগিলাম। ক্রমে এই পথে নামিয়া বিষ্ণুগঙ্গা বা ধবলগঙ্গার তীরে আসিলাম। এই স্থান হইতে পুলের উপর যাইবার রাস্তা আরও কদর্য্য। এমন গড়ানে রাস্তা কোন প্রকারে প্রাণটী হাতে করিয়া পুলে উঠিতে হয়। কাঠের কাঁচা পুল। এই পুলের নিম্নভাগ দিয়া প্রবলতর উচ্ছ্বাসে বিষ্ণুগঙ্গা আসিয়া অলকনন্দার সহ মিলিত হইয়াছেন।

এই সঙ্গম স্থানকে বিষ্ণুপ্রয়াগ বলে। বিষ্ণুপ্রয়াগে গঙ্গার গভীর গর্জ্জনে কান ফাটিয়া যায়। এই ভীষণ গঙ্গার প্রবাহ যেন ভৈরব কল্লোলে ছুটিতেছে। আমরা অতি সাবধানে সতর্কতার সহ এই পুল পার হইয়া উচ্চ তীরভূমিতে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল গঙ্গার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস দেখিতে লাগিলাম। তটের উপরিভাগেই বিষ্ণুমন্দির, সঙ্গম স্থান হইতে খাড়া ঊর্দ্ধে উচ্চ পাহাড়ের উপর এই বিষ্ণুমন্দির। মন্দির অভ্যন্তরে ভগবানের মূর্ত্তি আছে। আমরা শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া সঙ্গম ঘাটে নামিবার ইচ্ছা করিলাম। দেখিলাম মন্দিরের পার্শ্ব হইতে সঙ্গম ঘাটে নামিবার জন্য পর্ব্বতের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিঁড়ির মত করিয়া দিয়াছে। আর পর্ব্বতের গাত্র হইতে সঙ্গমঘাট পর্য্যন্ত সিঁড়ির দুই ধারে দুই গাছা মোটা লোহার শিকল বাঁধা আছে, তাহাই ধরিয়া যাত্রীরা সঙ্গমঘাটে নামিয়া থাকে; কিন্তু একবার পদস্খলন হইলেই গঙ্গালাভ হইবার সম্ভাবনা। এখানে বিষ্ণুগঙ্গা যেন উদ্দাম ভাবে নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গমঘাটে নামিয়া স্নান করা দুঃসাধ্য। আমরা বিষ্ণুগঙ্গার জল একটু মস্তকে স্পর্শ করিলাম। বিষ্ণুপ্রয়াগ বদরীগমনের দ্বারস্বরূপ। এই ধবলগঙ্গাই বিষ্ণুগঙ্গা নামে অভিহিতা। আমরা বিষ্ণুগঙ্গাকে প্রণাম করিয়া আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম — বিষ্ণুমন্দির হইতে দেড় মাইল দুই মাইল গিয়া অলকনন্দার পুল আবার পার হইয়া, আরও তিন মাইল আসিয়া আমরা ঘাটচটীতে আসিলাম। এখানে একটু বিশ্রাম করিয়া আরও তিন মাইল আসিয়া আমরা পাণ্ডুকেশ্বর চটীতে আসিলাম। পাণ্ডুকেশ্বরের আর একটী নাম যোগবদরী। পাণ্ডুকেশ্বর স্থানটী অতি রমণীয়। ছায়াশীতল বৃক্ষ

সকল চটীর চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে—নিকটেই ঝরণার সুমধুর জল ও পাঁচ ছয় খানা দোকান ও চটী আছে। প্রবাদ আছে এই স্থানে মহারাজ পাণ্ডু না জানিয়া মৃগভ্রমে মুনিপুত্রের প্রাণবধ করিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে আসিয়া তপস্যা করেন, পরে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে আসিয়া বহুকাল পত্নীদ্বয়সহ উৎকট তপস্যা করিয়া ঋষিদিগের নিকট পুত্রবর লাভ করিযাছিলেন। এই স্থানে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবীর মুর্ত্তি আছে। এই পাণ্ডুকেশ্বর নাকি সেই পুরাকালের পাণ্ডুস্থান। আমরা এই খানেই আজ স্নান আহার সম্পন্ন করিবার ইচ্ছায় এই পাণ্ডুকেশ্বর চটিতে রহিলাম। যথা সময়ে স্নানপূজা সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনান্তে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার মোট ঘাট বাঁধিয়া পথে বাহির হইলাম। আমাদের মনে যে কি বিপুল আনন্দ উচ্ছাস উঠিতেছে, তাহা বলিবার নয়। ক্রমেই আমরা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর পরমধামের নিকটবর্ত্তী হইতেছি। এখান হইতে আমরা আধ মাইল আসিয়া শেষধারা নামে একটী প্রস্রবণ ও শেষনাগের ক্ষুদ্রমন্দির দেখিলাম। রাস্তার দুই ধারে সদ্যঃবিকসিত লতানে-গোলাপ রাশি রাশি ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহার সৌরভে দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছে। এখানকার রাস্তাটীও চড়াই রাস্তা। এই শেষধারা হইতে প্রায় তিন মাইল হাঁটিয়া আমরা লামবগড় নামক চটিতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। এই স্থানে সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া রাত্রে মুদির নিকট হইতে আটা ঘি আলু কিনিয়া আহার সমাপ্ত করিলাম। পরশু সংক্রান্তি, ঐ দিন আমরা বিষ্ণুভগবানের চরণ কমল দর্শন করিব। এই লামবগড় চটীতে কয়েক খানি দোকান আছে ও একটী ধর্ম্মশালাও

আছে। রাত্রে বদরীবিশাল প্রভুকে স্মরণ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া জয় বদরীবিশাল বলিয়া সকলেই পথে বাহির হইয়া পড়া গেল। সেখান হইতে হনুমানচটী আসিয়া পৌছিলাম। এখানে হনুমানজীর মন্দির আছে। ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত এবং তিন চারিখানা দোকানও আছে। সমস্ত বদরী-নারায়ণের যাত্রীদল আজ এই হনুমান চটীতে আশ্রয় লইয়াছে—চটীতে খুব ভিড়; সকলেই কাল শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছে। এই হনুমান চটীর নিকটেই মরুত্ত রাজার যজ্ঞস্থল বলিয়া পাণ্ডারা দেখাইলেন। এখনও নাকি এই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে সেই যজ্ঞের অঙ্গাররাশি দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে এই মরুত্ত রাজার অপূর্ব্ব যজ্ঞের কথা উল্লেখ আছে। ঐ যজ্ঞে সহস্র কোটী ব্রাহ্মণের জন্য সুবর্ণময় ভোজ্যপাত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পৃথিবীর ধনরত্ন ঐ স্থানে আহৃত হইয়াছিল। এই সেই পবিত্র যজ্ঞভূমি—আজও জগতের বক্ষে জাগ্রত রহিয়াছে। রাত্রে হনুমান চটীতেই থাকা গেল। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য, আজ আমাদের সুপ্রভাত। আমরা আজ বিষ্ণুক্ষেত্রের দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছি। আনন্দে যাত্রীদল পুলকপূর্ণ হইয়া বারম্বার জয় বদরীবিশাল, জয় বদরীবিশাল বলিয়া চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। এই স্থানে পথপার্শ্বে অপরিমিত সদ্যঃবিকসিত প্রফুল্ল কুসুমরাশি ফুটিয়া পথটী যেন আলোকিত করিয়া আছে। দিব্যগন্ধে নাসা ভরিয়া যাইতেছে। প্রকৃতিদেবী বোধ হয় তাঁহার স্বহস্ত অবচিত কুসুম সম্ভার লইয়া যেন শ্রীভগবান্

বিষ্ণুর চরণে অঞ্জলি দিতেছেন। চতুর্দ্দিকে ধবল-শুভ্র তুষারময় গিরিশৃঙ্গ। আর যৌবনচঞ্চলা যুবতির ন্যায় অলকানন্দা তটভূমি মুখরিত করিয়া প্রবলবেগে প্রবহমানা। তবে রাস্তাটী বিলক্ষণ চড়াই। আবার মনে হইতেছে যেন সেই মেঘরাজ্যে উঠিতেছি। রাস্তায় খুব ভিড়, যাত্রীর জনতা। তাহার উপর পাহাড়ী পুরুষ রমণীগণ বালক বালিকা ও শিশুগণকে লইয়া দলে দলে বদরিকা চলিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে সংসারের সমস্ত জিনিস আছে—তৈজস পত্র, ঘড়াঘটী, বাসন, বিছানা-পত্র, ছাগল, চমরীগাই প্রভৃতি সমস্ত লইয়া ইহারা এখন ছয় মাসের জন্য বদরিকাবাস করিতে বা দোকান পসার করিতে যাইতেছে। তাহার উপর ভারবাহী ছাগলপাল লইয়া ছাগপালকগণ রাস্তা জুড়িয়া চলিয়াছে। আমরা যতই নারায়ণক্ষেত্রের সন্নিকট হইতেছি ততই প্রভুর দর্শনের আশা বলবতী হইতেছে। পথের মধ্যে পাহাড়ি বালকগণ ঢক্কাধ্বনি করিয়া যাত্রীদের নিকট পয়সা লইতেছে। ছোট ছোট পাহাড়ি বালক বালিকাগণ ভগবান্ বদরীনাথের স্তুতিগান গাহিয়া পয়সা লইতেছে। সেই স্তুতিগানের কিয়দংশ আমি লিখিয়া আনিয়াছি—গানটী বড় সুন্দর, বড় মধুর। বালক বালিকাগণ নাচিয়া নাচিয়া মধুস্বরে গাহিতেছে—

পবনমন্দ সুগন্ধ শীতল
হেমমন্দির শোভিতম্
নিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল
বদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্।

শেষ সুমিরন করত নিশিদিন
ধ্যান করত মহেশ্বরম্॥
বেদ ব্রহ্মা করত অস্তুতি
বদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
ইন্দ্রচন্দ্র কুবের ধুনিকর
ধূপ দীপ প্রকাশিতম্।
সিদ্ধ মুনিগণ করত জয় জয়
শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥

আমি পুনঃ পুনঃ এই স্তুতিগানটী আবৃত্তি করিলাম। ভগবানের মধুর নামটী স্মরণ করিয়া চক্ষে জল আসিল। আমরা এক মাইল আসিয়া বৈখানস মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। এখানে শীত অতি ভীষণ—শীতে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া আমরা ধীরে ধীরে চলিলাম। ক্রমে উর্দ্ধ পর্ব্বত শিখরে উঠিতে লাগিলাম। আবার সেই কেদার-নাথের রাস্তার ন্যায় এই রাস্তাটীতেও মেঘরাজ্য ভেদ করিয়া উঠিতে হইতেছে। সম্মুখের শৈলশিখরগুলিতে প্রভাত সূর্য্য কিরণ প্রতি-ফলিত হইয়া যেন সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। বদরী-নারায়ণ ধামের আর তিন মাইল মাত্র পথ আছে, কিন্তু সম্মুখের গিরিশৃঙ্গটী একবারেই তুষারে আচ্ছন্ন। যে দিকে চাই অনন্ত তুষাররাশি। আর উচ্চগিরি শিখর হইতে কল কল রবে ঝঙ্কার করিয়া স্বর্গগঙ্গা অলকনন্দা ভীমবেগে নামিয়া আসিতেছেন। অলকনন্দার প্রবাহে যেন গিরিশৈলগুলিও কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। গমন করিতে করিতে ক্রমেই বরফস্তূপ আমাদের সন্নিহিত হইল।

এই দুর্লঙ্ঘ্য বরফরাশি দেখিয়া ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিলেন তিন মাইল বরফ ভাঙ্গিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া বুকের মধ্যে গুর গুর করিতে লাগিল। মনে মনে বলিলাম প্রভু দয়াময়! একবার মহাপাতকীকে দেখা দিও, প্রভু সহায়হীন সামর্থ্যহীন কাঙ্গাল আমি। কিন্তু এ যে দেখিতেছি আরও ভয়ানক দুর্গম রাস্তা। কি করিয়া এ তুষরাচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করিব। কেদার প্রভুর বরফাবৃত পথ যদিও দীর্ঘ পথ ছিল কিন্তু সেই স্থান কতকটা সমতল ছিল। কিন্তু এ রাস্তাটী অতি দুর্গম। একবারে ঢালু পাহাড়ের গাত্রে তুষারাচ্ছন্ন রাস্তা—তাহার নিম্নে কাঞ্চন গঙ্গা বা ধবল গঙ্গা। এই গঙ্গার দুগ্ধের ন্যায় জল। এই পর্ব্বত গাত্রস্থিত ঢালু পথটী বরফাবৃত হইয়া এত পিচ্ছিল হইয়াছে যে, পা রাখিবামাত্র পড়িয়া যাইতেছি—একবার পাহাড়ের নীচে পড়িলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব লাভ হইবে। এ সকল পর্ব্বতশৃঙ্গে বৃক্ষলতা তৃণাদিও নাই যে তাহা আশ্রয় করিয়া যাইব। হরি পারাবার ভবের কাণ্ডারী একমাত্র তুমি বই আর কেহ নাই। এই বলিয়া সজলনয়নে তাঁহাকে প্রাণপনে ডাকিতে লাগিলাম। এ পথে আর কাণ্ডি ওঠা দুঃসাধ্য, কেননা শুধুই বরফের স্তূপ—কোন কোন স্থানে বরফগুলি বড় বড় গোলার মত পড়িয়া আছে। আমি কাণ্ডিওয়ালা গোলাপ সিংহের হাত ধরিয়া শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে দু এক পা করিয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিন্তু বারম্বার পদস্খলন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। দুই তিনবার গড়াইয়া পড়িলাম। ভাগ্যে গোলাপ সিং ধরিল তাই প্রাণটা রক্ষা হইল। এই ভয়ানক পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর এই তুষারাচ্ছন্ন পথে

ওঠা জীবন সংশয়। তবে যে মরি নাই, তা' সেই অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাত্রীদল সকলেই আপনার আপনার প্রাণ লইয়া ত্রস্ত। আমি কতকটা পথ বসিয়া বসিয়া গেলাম। শীতে হিমে কম্পান্বিত কলেবর হস্তপদ অবশ অসাড়; তাহার উপর হিমে যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে, বুকের রক্ত যেন জমাট হইয়া যাইবে। ঠাকুর রক্ষা কর এ পথে তুমি বই আর কেহ নাই বলিয়া বারম্বার অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে ডাকিলাম ও খানিকটা পথ হামাগুড়ি দিয়া উঠিলাম। এমন সময় পাহাড়ি একটী আসিয়া কোদাল হস্তে ঐ বরফাবৃত পথ একটু একটু করিয়া খুঁড়িয়া দিল, তবে তাহার উপর দিয়া এক পা এক পা করিয়া চলিতে লাগিলাম। পাণ্ডারা বলিলেন- মাইজী ইহা স্বর্গপথ। নিজের পুণ্যবলেই এই রাস্তা জীব পার হইয়া শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া থাকে; এখানে গরুড় মহারাজকে স্মরণ কর তিনি তোমায় পৌছাইয়া দিবেন। মনে মনে ভাবিলাম ইহা সত্য কথা—এস্থান নরলোকের অগম্য। ইহা দেবমার্গই বটে। তবে শুনিলাম জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বরফ গলিয়া রাস্তা বাহির হয়। এখন বৈশাখ মাস— এক মাস পরে গ্রীষ্মের সময় বরফ কিছু গলিতে পারে। কিন্তু চিরহিমানী মণ্ডিত হিমালয় ত কখন বরফশূন্য হইবে না! একটু পরে চাহিয়া দেখি আমাদের সম্মুখেই নরনারায়ণ পাহাড়ের অত্যুন্নত অচলশিখর সদর্পে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছে! বদরী প্রবেশের দ্বার হইতে এই নরনারায়ণ পাহাড় দেখা যায়। নরনারায়ণ পাহাড় শুনিয়াই আমার চক্ষে আনন্দাশ্রু ঝরিতে

লাগিল। আমি মনে মনে বলিলাম আজ জীবন সার্থক, আমি সেই চির বাঞ্ছিত বদরীবিশাল ধামে আসিয়াছি। এক্ষণে কৃপা করিয়া একবার দেখা দিও ঠাকুর! আজ যাহা এই স্থূল চক্ষে দেখিতেছি তাহা আমার কল্পনার অতীত। এই কি সেই বদরিকা ক্ষেত্র? এই কি সেই পরম পবিত্র পুণ্যস্থান, নরনারায়ণের তপস্যাক্ষেত্র? এই কি ভগবান্ শুকদেবের সাধনাভূমি এবং মহামতি বেদব্যাসের অষ্টাদশপুরাণ ও ভাগবত রচনার স্থান? এই কি উদ্ধবের তপস্যাভূমি ও শুকসনক ব্যাস বশিষ্ঠের লীলাভূমি? আজ সত্যসত্যই আমার জন্ম সফল হইল। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিতে করিতে ভগবান্ বদরী নারায়ণের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আমার বদরিকার পাণ্ডা লক্ষীনারাণ রামপ্রসাদ পাণ্ডার লোক ছিল। তিনি আমায় সযত্নে লইয়া গিয়া একটী দ্বিতল গৃহে লইয়া বসাইলেন। ঘরগুলি কাঠের ঘর, ঘরের মধ্যে চেটাই কম্বল পাতা। পাণ্ডা আমাদের জন্য এক মন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা হিমে শীতে অর্দ্ধমৃত হইয়া যখন পাণ্ডার উক্ত গৃহে আশ্রয় লইলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা কি দুইটা হইবে। তখনও সে হিমপুরী হিমাচ্ছন্নগৃহের ছাদগুলি হইতে ক্রমাগত বরফ গলিয়া জলধারা পতিত হইতেছে। রাস্তার দুই পার্শ্বেই দোকানে দোকানে লুচি কচুরি জিলাবি ভাজিতেছে। ঐ দোকানগুলি যাত্রীর জন্যই বসিয়াছে। দোকানগুলির ছাদ বরফাবৃত। গৃহের নিম্নতল বরফপূর্ণ, দ্বিতলে বসিবার একটু স্থান আছে। বাটীর উঠানগুলি তখন পর্য্যন্ত বরফে ঢাকা। পাণ্ডারা বলিলেন মাইজী আজ পাঁচ সাত রোজ বরফ রোজ

গিরতেছি। আমাদের শরীর তখন শাতে হিমে মৃতবৎ, আমরা বাসায় আসিয়া ভিজা জুতা মোজা খুলিয়া তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালিতে বলিলাম। পাণ্ডাও আগুন জ্বালিয়া দিলেন; সকলেই আগুনের চতুর্দ্দিকে বসিয়া যেন প্রাণ পাইলাম। কিন্তু সেই হিমপুরীতে অগ্নির নিকট বসিয়াও যেন উত্তাপ নাই বোধ হইতে লাগিল। দুই ঘণ্টা বসিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইলাম। পরে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীভগবান্ বদরীনাথের দর্শন উদ্দেশে নামিয়া আসিলাম। তখন বেলা পাঁচটা, দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তুলারাশির ন্যায় বরফ পতিত হইতেছে। বরফপাত দেখিয়া আর বাসা হইতে বাহির হইতে পারিলাম না। পাণ্ডা ঠাকুর অনেক কষ্টে আমাদের জন্য বাজার হইতে মোটাপুরী ও পেঁড়া কিনিয়া দিলেন। তাহাই দু-একখান করিয়া আহার করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। পাণ্ডা প্রত্যেক যাত্রীকে এক এক খানি করিয়া মোটা কম্বল গায়ে দিবার জন্য দিয়া গেলেন। আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ বোধ হওয়ায় সে দিন আর শ্রীভগবানের মন্দিরে যাইতে পারিলাম না। গৌরবাবু তাঁর ভগ্নী ও মাসী মন্দিরে গিয়া দর্শন করিয়া আসিলেন। সমস্ত রাত্রি বরফপাত হইল, রাত্রে এত শীত বোধ হইল যে কম্বল যেন জল হইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়াও ভয়ানক ঠাণ্ডা আসিতে ছিল। সমস্ত রাত্রি শ্রীভগবান্‌কে ব্যাকুল প্রাণে ডাকিলাম, প্রাতে শরীর স্বচ্ছন্দ বোধ হইল। পাণ্ডা আসিয়া আমাদের তীর্থস্নান করাইবার জন্য লইয়া গেলেন। মন্দিরের নিম্ন-ভাগে মন্দাকিনীর ঘাট; তাহাতে হিমশীতল বারিরাশি, কাহার সাধ্য মন্দাকিনীতে নামিয়া স্নান করে; বোধ হয় ঠাণ্ডায় তখনি মরিয়া

যাইবে। তা ছাড়া উচ্চ গিরিশিখর হইতে মন্দাকিনী ভীমবেগে নামিতেছেন ; তাঁহার বিপুল তরঙ্গ উচ্ছ্বাস দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পাণ্ডা মন্দাকিনী হইতে একটু জল তুলিয়া আমাদের মন্ত্রপূত করিয়া মস্তকে দিলেন। তাহার পর আমরা সকলেই তপ্তকুণ্ডে নামিয়া স্নান করিলাম। ভগবানের কি অসীম মহিমা! এই তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের মধ্যে কি সুন্দর তপ্ত কুণ্ডের জল জীবের কষ্ট দূর করিবার জন্য ভগবান্ রাখিয়াছেন। নিম্নে অলকনন্দার ঘাট। কিছু উপরে শ্রীভগবান্ বদরীনাথের মন্দির। মন্দিরের নীচে তপ্তকুণ্ড। কুণ্ডটী বেশ প্রশস্ত, কুণ্ডে নামিয়া স্নান করিতে বড় আরাম। এই তপ্ত কুণ্ডের মধ্যে দুই দিক হইতে দুইটী ধারা আসিয়া পতিত হইতেছে। স্নানের কি আরাম! প্রায় এক বুক জল হইবে, তাহাতে স্বচ্ছন্দে স্নান করা যায়। আমরা প্রাতে যখন স্নানার্থে নামিলাম, দেখিলাম বদরীনাথের পুরোহিতগণ মন্ত্রপাঠ করিয়া সকলেই তপ্তকুণ্ডে স্নান করিতেছেন। আমরা সংকল্প করিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া গায়ে মোটা কাপড় শীতবস্ত্র দিয়া শ্রীভগবান্‌কে দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম ও তাঁহার পূজার সামগ্রীগুলিও লইয়া চলিলাম। সকলেই শ্রীভগবানের পূজার জন্য মেওয়া মিছরি তুলসীপুষ্প ও মন্দাকিনীর পবিত্র জল লইয়া ভগবানের মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলাম এবং তৎসঙ্গে এক একটী সুবর্ণময় তুলসীপত্র প্রভুর জন্য লইয়া গিয়াছিলাম। গৌরবাবু আমাদের দর্শনের জন্য সকলকে সঙ্গে লইয়া মন্দির দ্বারে পৌঁছিলেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। দেখিলাম প্রশস্ত মন্দির। মন্দিরে বৃহৎ সুবর্ণময় ছত্র শোভিত। ছত্রের নিম্নে

শ্রীভগবান্ বদরীনারায়ণ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। শ্রীভগবানের মূর্ত্তিটী বড় মনোহর। নবজলধর শ্যামসুন্দর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী—বক্ষঃস্থল মণিমুক্তা ভূষিত, কেয়ূর কুণ্ডল কিরীট—আহা কি অপূর্ব্বরূপ। কোটী কন্দর্প নিন্দিত ভুবনমোহন মূর্ত্তি! আনন্দে নয়নে জল আসিল। গৌরবাবু অগ্রগামী হইয়া পণ্ডিতদের বলিয়া একবারে আমাদের —বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন। আমরা জয় বদরীবিশাল বলিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহার দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম, ও যৎসামান্য পূজা উপহারগুলি পাণ্ডার হস্তে দিয়া অঞ্জলীবদ্ধ হইয়া তাঁহার স্তোত্রপাঠ করিয়া বারম্বার লুণ্ঠিত মস্তকে বিষ্ণুচরণে প্রণাম করিলাম। প্রভুর অঙ্গ মণিময় আভরণে ভূষিত হওয়ায় অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল, এবং প্রভুর মস্তকে রত্নমুকুট শোভিত হওয়ায় অতি মনোহর শোভা হইয়াছিল। বিগ্রহের সম্মুখে ঘৃতদীপ জ্বলিতেছিল। পুষ্পাভরণভূষিত শ্রীঅঙ্গের কি কমনীয় ভাব! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিগ্রহ মূর্ত্তি পাণ্ডারা স্পর্শ করিতে দেয় না, বলে দর্শনেই জীব সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়। আজ আমার মানবজন্ম সফল হইল। শ্রীভগবানের দর্শনে পাপতাপ দূরে গেল। আমি ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে বলিলাম—"প্রভু ভবযন্ত্রণা মোচন করিও।" বদরিকাধাম বিষ্ণুধাম; এস্থানে বড় ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানের পূজাপাঠ, ভোগরাগ, আরতি, সমস্তই মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দ্বারের রক্ষী স্বর্ণময় আশাশোটা, স্বর্ণছত্র, স্বর্ণময় চামর দ্বারা শ্রীভগবানকে ব্যজন করিতেছে। পূজার উপকরণ তৈজসাদি সমস্তই স্বর্ণরৌপ্য নির্ম্মিত। শ্রীভগবান্ রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট; বিগ্রহের বামদিকে লক্ষ্মীদেবী ও নারদ উদ্ধব

প্রভৃতি ভক্তগণের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। প্রবাদ আছে বদরীনাথ অতি প্রাচীন মূর্ত্তি, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক স্থাপিত। কিন্তু মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে, সত্যযুগে ঐ স্থানে তপস্যা -ভূমি ছিল এবং নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় সহস্র বৎসর এই স্থানে উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে লীলাসম্বরণ করিলেন, তখন উদ্ধবকে বদরিকা আশ্রম গমন করিয়া যোগারূঢ় হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। মহাভারত পাঠে জানা যায়—পাণ্ডুবংশধর রাজা যুধিষ্ঠির এই বদরিকা আশ্রম হইতেই স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। মহামতি বিদুর ও বলভদ্র প্রভৃতিও এই বদরীতীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শুক সনক নারদ ব্যাস প্রভৃতি মহাঋষিগণের এই বদরিকা ক্ষেত্রই সাধনক্ষেত্র ছিল।

ভগবানের এই শ্যামসুন্দর মনোহর রূপ দেখিয়া চক্ষু যেন জুড়াইয়া গেল। প্রভুর মন্দিরের সম্মুখভাগে নাটমন্দির। এই স্থানে বসিয়া কেহ বা জপ করিতেছে, কেহ বা স্তব স্তুতি করিতেছে। মন্দির দ্বারে প্রভুর বাহন গরুড় মহারাজের মূর্ত্তি এবং অন্যদিকে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানকার পূজারিগণের বেশ বিনীত ভাব ও নম্র বৃত্তি। তাঁহারা যত্ন করিয়া সকল যাত্রীকেই দর্শন করাইতেছেন। শুনিলাম ইঁহারা সকলেই কেরল দেশের ব্রাহ্মণ। ইঁহারা অতি শুদ্ধাচারী ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। যাহা হউক আজ শ্রীভগবানের কৃপায় আমার চিরদিনের সাধ মিটিল, প্রভুকে দর্শন করিয়া প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া, বাহিরে আসিয়া মহাপ্রসাদ কিছু কিনিয়া মন্দাকিনী তটের উপর ব্রহ্মকপাল নামক স্থানে পাণ্ডার সহ উপস্থিত হইলাম। এই

ব্রহ্মকপাল পরম পবিত্র স্থান। এই স্থানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয় ও তর্পনাদি করিতে হয়। পাণ্ডা বলিলেন মাইজী এই ব্রহ্মকপালে পিণ্ড দান করিলে নিশ্চয়ই পিতৃলোক উদ্ধার হইবেন। পবিত্র শাস্ত্র বাক্য এই যে, ব্রহ্মকপালে পিণ্ডদান করিলে আর গয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে হয় না। এই স্থানটী বদরীনাথ প্রভুর মন্দির হইতে আধ মাইল দূরে অলকনন্দার তটের উপর। আমরা সাধ্যমত উপচার লইয়া ও মহাপ্রসাদ দ্বারা পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলাম। পিণ্ডদান কালে আমার নয়নে অজস্র জলধারা পড়িল। আমি আমার মধ্যম পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূ, জ্যেষ্ঠা কন্যারও ব্রহ্মকপালে পিণ্ডদান করিলাম। অলকনন্দার তটে যেমন ভয়ানক শীত, তেমনি হিমালয়ের হিমশীতল বায়ু। অতি কষ্টে কম্বল গায়ে দিয়া পিণ্ডদান সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিয়া আসিলাম। পরে পাণ্ডা আমাদের পঞ্চতীর্থ দর্শনের জন্য বলিলেন। প্রথম ঋষিগঙ্গা। দ্বিতীয় কূর্ম্মধারা। এটি বদরিকা বাজারের ভিতরে। তৃতীয় প্রহ্লাদধারা। চতুর্থ তপ্তকুণ্ড। পঞ্চম নারদ-কুণ্ড। তাহার পর নারদশিলা, দ্বিতীয় বরাহশিলা, তৃতীয় নরসিংহ শিলা, চতুর্থ গরুড়শিলা, পঞ্চম মার্কণ্ডশিলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সকলগুলি দেখা আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। সমস্ত রাত্রি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তুষারপাত হইয়াছে। প্রাতেও সেই অবস্থা। আকাশ অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, অল্প তুলারাশির ন্যায় তুষার পাত হইতেছে। ভয়ানক শীত। অগত্যা তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম। বাজার হইতে পুরি কিনিয়া আহার কার্য্য সমাধা করিলাম। বৈকালে

পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন, আজ রাতকে ভগবানজীকে প্রসাদ মিলেগি। আমরা প্রসাদ পাইব শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। সন্ধ্যার সময় আকাশ আরও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গাঢ় অন্ধকার হইল, সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত। জানলা দিয়া তুষার কণা সব আসিতে লাগিল। শীতে বাতাসে কম্পিত কলেবর হইয়া বাসায় পড়িয়া রহিলাম। সন্ধ্যার পর পাণ্ডাঠাকুর আমাদের জন্য বদরীনারায়ণের প্রসাদ লইয়া আসিলেন। আমরা বিছানা ছাড়িয়া সকলেই প্রসাদ পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিলাম। পাণ্ডা ঠাকুর আমাদের মহাপ্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন। কি অপূর্ব্ব প্রসাদ! তাহার কি সদ্‌গন্ধ! কি সুস্বাদু! সে স্থানে অন্য তরকারি কিছুই পাক হয় নাই; কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সৌরভযুক্ত ঘৃতান্ন ও ডাল ও তিন চারি প্রকার বেসমের বড়ি, ফুলারি ভাজা ও দুইখানি করিয়া মালপোয়া ও মিষ্টান্ন পায়স ইত্যাদি মহাপ্রসাদ খাইয়া আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। বোধ হয় জীবনে এমন সুস্বাদু অন্ন খাই নাই। প্রবাদ আছে—নারায়ণের অন্ন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পাক করিয়া থাকেন; এ যে দেবভোগ্য অন্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুরীতে যেমন মহাপ্রসাদ বিতরণ হয় এখানেও সেইরূপ প্রসাদ বণ্টন হইয়া থাকে। পুরীর ন্যায় এ স্থানেও এক একটী উনানে ৩।৪টী হাঁড়ি চড়াইয়া অন্নপাক হইয়া থাকে। ঐ প্রসাদ যাত্রীগণকে ও পাণ্ডাগণকে প্রত্যহ বাটিয়া দেওয়া হয় এবং পুরোহিত মহাশয়েরাও ঐ প্রসাদ ভক্ষণ করেন। কিন্তু দিবাভাগে অন্নভোগ হয় না। দিনের বেলা মিষ্টান্ন, পকান্ন, দুগ্ধ নবনীত ইত্যাদি প্রভুর ভোগ হইয়া থাকে; রাত্রে অন্নভোগ হয়। এই

দুর্গম হিমালয় গিরিশিখরে যে প্রভুর অন্নভোগ হইতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহা হোক আমরা প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। পুরীক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও স্পর্শদোষ নাই। ভগবান্ বদরীনাথের পুরী অতি সুন্দর। পাণ্ডা বলিলেন—এই বদরীক্ষেত্র কৈলাস ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের নিম্নভাগে অলকনন্দার তটে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত সকল তুষারাচ্ছন্ন। কত শত সাধু মহাত্মা এই হিমালয়ের গিরিগুহায় বাস করেন। এস্থান আনন্দময়, হিংসাদ্বেষ-দ্বন্দ্ব বর্জ্জিত। সকলেই ভগবদ্ দর্শনে উৎফুল্ল। কত কত ধনীশ্রেষ্ঠ দয়ালু মহাত্মাগণ সাধু সেবায় অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। আমরা দুইদিন দুইরাত্রি ৺বদরীনাথধামে বাস করিয়া তিন দিনের দিন প্রাতে ফিরিবার আয়োজন করিলাম। মনে করিয়াছিলাম তিনরাত্রি বাস করিব, দুর্ভাগ্য ক্রমে ঘটিল না। দ্বিতীয় রাত্রিতে সমস্ত রাত্রি তুষারপাত হইল, প্রাতে গৃহের ছাদ ও অঙ্গনটি ধবলাকার একহাত দেড় হাত পরিমাণ বরফে আচ্ছন্ন ও তাহার সঙ্গে হিমশীতল বাতাস বহিতেছে এবং আকাশের অবস্থা দেখিয়া সকলেই মনে মনে ভীত হইলেন, কিরূপে এই হিমালয় উত্তীর্ণ হইব। গৌরবাবু বলিলেন মা ঠাকরুণ যদি এরূপ বরফ আরও পাঁচ সাত দিন পড়ে, তবে বরফে চাপা পড়িয়া মরিতে হইবে, এক্ষণে এস্থান হইতে গমনই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া মোট ঘাট বাঁধিতে বসিয়া গেলেন। আমরা জিনিষ পত্র গুছাইয়া বাঁধিলাম। পরে একটু আকাশ পরিষ্কার হইয়া তুষারপাত বন্ধ হইলে প্রভুর মন্দিরে গিয়া আর একবার নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়া ও প্রণাম করিয়া বদরীনাথ দর্শন করিলাম। যাত্রীরা

বসুধারা দর্শনে গমন করিলেন। বদরীনাথ হইতে ছয় মাইল দূরে এই বসুধারা তীর্থ। এইস্থানে যাইবার মানা-গ্রাম পর্য্যন্ত পথ আছে। তাহার পর দুরারোহ হিমালয় শৃঙ্গ দিয়াই যাইতে হয়। সে পথ চির তুষারাবৃত। গৌরবাবু আমাদের পাণ্ডাকে বসুধারা লইয়া যাইতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, পাণ্ডা বলিলেন,—আভিত বরফমে রাস্তা বন্ধ হোগেয়া। এই পথে যাইতে ইন্দ্রধারা দর্শন হয়। আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ বরফ পাত হইতেছে, এজন্য সে পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পথে পাণ্ডাদের নিকট সে পথের রমণীয়তা শুনিয়া দর্শনের আশা নিতান্তই বলবতী হইয়াছিল। ইন্দ্রধারার পরে গণেশ গুহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর ব্যাস পুস্তক নামে পরম রমণীয় পাহাড়—যেন পুস্তকের ন্যায় থাকে থাকে সাজান আছে। ঐ স্থানে নাকি ভগবান্ ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ ও সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। শুনিলাম ঐ স্থানে ভীমসেতু নামে একটী বৃহৎ প্রস্তরময় সেতু আছে। মোট কথা এ রাস্তা অতি ভীষণ—মানুষের অগম্য। উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিয়া একব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, বসুধারা যাইবার পথে দুর্গম পাহাড়ের নিম্নে গঙ্গা। পাহাড়ের উপর দিয়াই পথ। আবার বরফে পা দিলেই বরফ বসিয়া যায়, তবে নিতান্ত শুরুবল থাকিলে দর্শন হয়। সেইস্থানে হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে দুইটী ধারা পতিত হইতেছে। প্রবাদ আছে, এই স্থানে জীবের পাপ পুণ্যের পরীক্ষা হয়। যিনি ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, তাঁহারই বসুধারা স্নানের ক্ষমতা থাকে। মানাগ্রাম বা মনি

ভদ্রপুরীর নিকট অলকনন্দার একসেতু আছে। ঐ সেতুপার হইয়া কিছু উপরে উঠিলে মাতাদেবীর মন্দির আছে। এ পুলের বাম দিক্ দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে; ঐ রাস্তার মধ্যে সহস্র ধারা ও চক্রতীর্থ প্রভৃতি তীর্থ আছে। মাতাদেবীর মন্দির হইতে ১২ মাইল গমন করিয়া সত্যপথ নামক স্থানে যাওয়া যায়। এই সকল তীর্থের পথ ও তাহার অগ্রবর্ত্তী স্থান সকল তুষারাচ্ছন্ন। সাধারণ লোকে প্রায় যাইতে পারে না। এ সকল পথে যোগী ঋষিগণমাত্র গমনে সক্ষম হয়েন। যা'হোক আমাদের ভাগ্যে এ পথের ইতিহাস মাত্র শুনা হইল। তাহার পর আমি 'ঠাকুর সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিও' বলিয়া সেই দুর্ল্লভ দর্শন শ্রীভগবানের চরণে বারম্বার অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া বাসায় আসিলাম। বাসায় পাণ্ডা ঠাকুর আমাদের সুফল দিতে আসিলেন। প্রত্যেক যাত্রীর নিকট ৫০৲ টাকা করিয়া চাহিলেন, আমি বলিলাম আমরা গরীব, এত টাকা দিবার সঙ্গতি নাই, আমার সাধ্যমত ২৫টী টাকা দিতেছি, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। গৌরবাবু তাঁহার পাণ্ডাকে একখানি গিনি ও নগদ টাকাও দিলেন ও গৌরবাবুর মাসী ও ভগ্নী ২০।২৫ টাকা করিয়া দিলেন। তাহার পর সকলেই একত্র হইয়া শ্রীভগবানের চরণকমল হইতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় লইয়া ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিতে করিতে অতিকষ্টে কতক পথ বসিয়া, কত পথ গোলাপ সিংহের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলাম। আসিবার সময় পিছিল বরফাচ্ছন্ন পথে দুই চারিবার পদস্খলন হইল। গমন সময়ে একটা রাস্তার নির্ণয় ছিল কেননা বরফপাত এতটা হয় নাই।

কিন্তু এই তিন দিন তুষারপাত হইয়া সমস্ত রাস্তা ভরিয়া গিয়াছে, রাস্তার নির্ণয় নাই। আমি দেড় মাইল আন্দাজ আসিয়া আর পারিলাম না। মস্তক ঘুরিয়া গেল। চক্ষে আঁধার দেখিতেছি। গোলাপসিংকে বলিলাম আমার আর গমনের সামর্থ্য নাই, আমি এই হিমালয়েই রহিলাম। কিন্তু প্রভুভক্ত গোলাপসিং চকিতের মধ্যে আমায় কাণ্ডিতে তুলিয়া লইল ও বলিল "মায়ি আঁখ" মুদ রহ। আমি চক্ষু মুদিয়া অবসন্ন ভাবে কাণ্ডিতে বসিয়া পড়িলাম। গোলাপসিং জয় বদরীবিশাল বলিয়া আমায় কাণ্ডিতে তুলিয়া বরফ স্তূপ ভাঙ্গিয়া নামিতে লাগিল। একে সেই ভীষণ পিচ্ছিল পথ, তাহার উপর তাহার পৃষ্ঠে এই দেড় মন বোঝা, কিন্তু ভগবান্ আমায় রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে বিপুল বল শক্তি ও অসীম সাহস দিলেন। সে আমায় লইয়া লঘুপদে হিমগিরি উত্তীর্ণ হইয়া নামিয়া আসিল। আমি তখন যেন সংজ্ঞা লাভ করিলাম।

৩রা জ্যৈষ্ঠ আমরা গৌরবাবুর সহ শ্রীভগবানের বিষ্ণুক্ষেত্র হইতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নামিতে লাগিলাম। নামিবার সময়ও সেই ভীষণ তুষারাচ্ছন্ন পিচ্ছিল পথ দিয়া অতি কষ্টে নামিতে লাগিলাম। খাড়া চড়াই পাহাড়ের উপর বরফাচ্ছন্ন, তাহার উপর সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন হইতেই তুষারপাত হইয়া আর রাস্তার নির্ণয় পাওয়া যাইতেছে না। চতুর্দ্দিকে কেবল শুভ্র তুষারময়ী মূর্ত্তি। তাহার নীচে কাঞ্চনগঙ্গা বা ধবলগঙ্গা প্রবল বেগে বহিতেছে। বৃক্ষ লতা, তরু গুল্ম কিছু নাই যে সেইটা অবলম্বন করিয়া নামিব। আমি আর হাঁটিতে পারিলাম না।

কক্তকটা পথ বসিয়া বসিয়া নামিয়া ছিলাম। তাহার পর গোলাপ সিংহের বাহুবলেই একেবারে ৮ মাইল পথ আসিয়া লাম্‌বগড় চটীতে পৌঁছিলাম। পথশ্রমে হিমে শরীর একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। চটীতে আসিয়া কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিলাম। সমস্ত দিনের অনাহারে শরীর বড়ই দুর্ব্বল বোধ হইল। এক ঘণ্টা পরে লুচি পেঁড়া কিনিয়া জলযোগ করিলাম। দুইটার সময় দুটী অন্ন পাক করা গেল। আহারান্তে সকলেই দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিলেন। পরে তিনটার সময় আবার বাহির হওয়া গেল। গৌর বলিল, "মা ঠাকরুন্, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না; যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। এই দূরদেশে যদি কেহ পীড়িত বা অসুস্থ হইষা পড়েন, তবে বিষম কষ্টে পড়িতে হইবে। এক্ষণে বাড়ী ফিরিবার চেষ্টা সকলেই প্রাণপণে করুন।"

অগত্যা সকলেই প্রাণপণে হাঁটিয়া শ্যামাচটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানে রাত্রিবাস করিতে হইবে। একটু বিশ্রামান্তে ঝরণা হইতে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যা বন্দনা সমাপ্ত করিলাম ও রুটী হালুয়া প্রস্তুত করিয়া আহার করা গেল। প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আবার যাত্রিদল হাঁটিতে আরম্ভ করিল। ফিরিবার পথেও সেই হনুমানচটি, লামবগড়, পাণ্ডুকেশ্বর, যোশিমঠ একে একে অতিবাহিত করিতে হইল। এক্ষণে আমরা বাড়ীমুখো বাঙ্গালী, সকলেই প্রাণপণে বাড়ী মুখে চলিয়াছি। কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় আমার পায়ে একটী কাঁটাও ফুটে নাই। হিমালয়ের পথের রমণীয়তা দেখিতে দেখিতে আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ভজন কীর্ত্তন করিতে করিতে পথ

হাটিতেছি। প্রাতঃকাল হইতে যাত্রীদল বেলা ১১টা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া পরে কোন চটীতে আশ্রয় লইত। আবার আহারাদির পরেও তিনটার সময় হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার সময় যে কোন চটিতে আশ্রয় লইতে হইত। সকলেই বাড়ী ফিরিবার আনন্দে উৎসাহে পথ হাঁটিতেছেন। পরদিন আমরা পিছলচটী আসিয়া পৌছিলাম। এ স্থানটী বেশ সুন্দর। পাহাড়ের উপর ছোট গ্রামখানি, এখানে অনেকগুলি দোকান, বাজার পোষ্টাফিস আছে। এখানে শীত কম বোধ হইতেছে। প্রাতঃকালে হাঁটিতে আমার বড়ই আনন্দ বোধ হইত। যখন বালারুণরাগে পূর্ব্ব গগন রঞ্জিত হইত, বনফুলের সুমিষ্ট গন্ধে দশদিক পূর্ণ হইত, আমি শীতল প্রভাত সমীরে ভগবানের গুণগান করিতে করিতে বড় আহ্লাদে চলিতাম। জগতের প্রতি বস্তুতেই যেন সেই মহিমাময় ভগবানের অনন্তসত্তা। পিপুলচটীতে আমরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লানসাঙ্গা বা চামৌলি আসিয়া পৌছিলাম ও মোট-ঘাট চটিতে ফেলিয়া পাণ্ডাকে বলিলাম, "ঠাকুর তুমি একবারপোষ্ট অফিস গিয়া খবর লও। আমার টাকাকড়ি কিছু আসিয়াছে কিনা।" আমি গমনকালে যোশিমঠ হইতে গৌরবাবুকে দিয়া আমার পুত্রকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম যে ২৫ টাকা চামৌলিতে আমার নামে পাঠাইয়া দেয়। পাণ্ডা তৎক্ষণাৎ পোষ্টাফিস গিয়া জানিয়া আসিল যে আমার নামে টাকা আসিয়া তিন দিন পড়িয়া আছে। গৌরবাবু ঐ টাকার জন্য পোষ্টাফিসে গেলেন, কিন্তু গাড়োয়ালের অধিবাসী পোষ্ট মাষ্টার বলিল যাহার নামে টাকা তাহার সাক্ষী একজন না হইলে টাকা আমরা দিতে পারিব না; সে লোক

এদেশী হওয়া চাই। এই লইয়া গৌরের সহ পোষ্ট মাষ্টারের বিবাদ হইল। টাকা সে কোনমতেই দিতে চাহেনা ; অগত্যা পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া আমি পোষ্টাফিসের নিকটে গমন করিয়া ঐ পাণ্ডা দ্বারা বুঝাইয়া বলিলাম যে, এ দূরদেশে আমার সাক্ষী কেহ নাই। একমাত্র সাক্ষী বদরীনাথ প্রভু আছেন। আমরা তীর্থযাত্রী—বিদেশী। এই কথা শুনিয়া তবে পোষ্ট-মাষ্টার মনিঅর্ডারখানি পাণ্ডার দ্বারা আমার কাছে পাঠাইয়া দিল। আমি সহি করিয়া ২৫টী টাকা লইলাম। ঐ দিন চমৌলিতেই থাকা হইল। এই লানসাঙ্গা এখানকার সবডিবিসন—এখানে থানা, পুলিশ কাছারি, ডাকঘর, হাঁসপাতাল আছে। সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যা করিলাম। আজিকায় সন্ধ্যাটী বড় রমণীয় বোধ হইল। একদিকে উচ্চ শৈলশিখর ও অন্যদিকে পুল—আর অলকনন্দার তটভূমিতে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছি। জ্যোৎস্না-মণ্ডিত ধরণী, মন্দ মন্দ শীতল পবন বহিতেছে। পক্ষীগণ নিজ নিজ নীড়ে বসিয়া কূজন করিতেছে। আর সম্মুখে অলকনন্দা ধীর মন্থরগমনে চলিয়াছেন। আকাশের কোলে ধূসর শৈলমালা যেন নবীন মেঘের ন্যায় বোধ হইতেছে। প্রকৃতির সুন্দর শোভা ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া দেখিলাম। পরে ধীরে ধীরে বাসায় চলিলাম। যোশীমঠ হইতে লানসাঙ্গা অবধি অনেক শস্য ক্ষেত্র দেখা যায়। দেখিলাম গোধূম যবাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। রাত্রে লুচি তরকারি করিয়া আহার করিয়া সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। প্রাতে উঠিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া অলকনন্দার তীরবাহী নূতন

রাস্তা ধরিয়া ধীরে ধীরে সকলেই চলিলেন। তিন মাইল আসিয়া একটী ছোট চটী পাওয়া গেল। আমি ঝরণা হইতে একটু জল পান করিয়া কাণ্ডিতে উঠিলাম। ২½ মাইল আসিয়া মচিয়ানা চটীতে আসা গেল। তাহার পর পথে আসিতে আসিতে দেখিলাম এক স্থানে বড় বড় সদ্যবিকসিত গোলাপ ফুটিয়া পথ আলো করিয়া আছে। ধরণী ধূসর বর্ণে ঈষদ্ আবৃতা হইয়া আছেন। পশ্চিম গগনে পাণ্ডুর আভা অস্তগামী শশাঙ্কের মলিন মুখ। আকাশ পটে কদাচিৎ কোথাও দুএকটা নক্ষত্র ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে বিহগগণের প্রভাতি গুঞ্জন আরম্ভ হইয়াছে, মন্দ মন্দ প্রভাত সমীরণে বনফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, রাস্তার দুই ধারেই বন। অনতিদূরে নীল মেঘের ন্যায় শৈলমালার সুন্দর দৃশ্য। কোথাও বা মৃগমৃগী ও মৃগশিশুগণ বন হইতে বনান্তরে দ্রুত পলায়ন করিতেছে। তাহাদের বিশাল নয়নের চকিত দৃষ্টির ভঙ্গীটী কেমন সুন্দর! গিরিপার্শ্বদেশ হইতে লোহিত রাগে রঞ্জিত নব রবির কনক কিরণ ছটা বৃক্ষ পত্রের মাথায় পড়িয়া স্বর্ণ কিরীটের ন্যায় শোভমান হইয়াছে। আমি প্রত্যহ ভোর ৪টার সময় সঙ্গীদের সহ প্রভাত বনভূমির সুন্দর শোভা দেখিতে দেখিতে পদব্রজে তিন চারি মাইল হাঁটিতাম এবং ক্লান্তি বোধ হইলে কাণ্ডিতে উঠিতাম। বেলা দশটা এগারটার মধ্যেই সকলে চটীতে উঠিত। আমিও মোটঘাট ফেলিয়া কম্বল বিছাইয়া খানিকক্ষণ শ্রান্তি দূর করিতাম। ও পরে স্নান পূজাদি সমাপ্ত করিয়া মুদির নিকট আধপোয়া আতপ চাউল ১ ছটাক ঘৃত লইয়া রান্না চড়াইতাম। পাকাদি সমাপন হইলে অন্ন গুলি ভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ

পাইতাম। আহারের পর আবার দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া তিনটা বাজিতেই রাস্তায় বাহির হইতাম। এ বেলা আর বেশী চলা হইত না, ৪ মাইল হাঁটিয়াই চটী লওয়া হইত। আমরা ক্রমে নন্দপ্রয়াগ আসিয়া পৌছিলাম। এখানে নন্দানদীর সহ অলকনন্দার মিলন হইয়াছে। সঙ্গম ঘাটে যাইতে পথের মধ্যে একটী সুন্দর বাগান দেখিলাম। তাহাতে অনেক ফুল ফলের—ডালিম, আম্র, বেল প্রভৃতির গাছ আছে। পাণ্ডা বলিলেন কোন সাধু মহাত্মার যত্নে এই বাগানটী প্রস্তুত হইয়াছে। নন্দার জল কালো। অলকনন্দার জল স্বচ্ছ-শুভ্র-নির্ম্মল। ক্ষুদ্র নন্দানদী যেন অলকনন্দার বিশাল বুকে ঝাপাইয়া পড়িতেছে। নন্দ-প্রয়াগ বেশ সুন্দর স্থান। এখানে নন্দ মহারাজ তাঁহার অনেক কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সঙ্গমঘাটে নামিয়া নন্দার জল একটু স্পর্শ করিলাম। প্রবাদ আছে পূর্ব্বকালে এইস্থানে কন্বমুনির তপস্যা স্থান ছিল। এখানে বশিষ্ঠেশ্বর শিব ও চণ্ডিকা মাতার মন্দির আছে, সাত আটখানা দোকান ও জলের ঝরণা আছে এবং ধর্ম্মশালা আছে। আমরা ধর্ম্মশালায় গিয়াই আশ্রয় লইয়াছিলাম। এই স্থানেই স্নান আহার সম্পন্ন করিয়া আমরা দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া আবার মোটঘাট বাঁধিয়া চলিলাম। পথের মধ্যে দুই চারিটা আম্রগাছ দেখিলাম। ছোট ছোট আম্রগুলি রৌদ্রে শুখাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। আমি দুই চারিটা কুড়াইলাম। তিন মাইল পরে সোনালাচটী আসিলাম। পরে আরও দুই মাইল আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভরতচটী আসিয়া রাত্রিযাপন করাই স্থির হইল। এখানে দুধ পাওয়া গেল। পেঁড়া ও দুধ খাইয়া শয়ন করিলাম। রাত্রি

১২টায় সময় চটাপট শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। সম্মুখের পাহাড়ে অগ্নি লাগিয়াছে। অগ্নি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া জ্বলিতেছে। সে দৃশ্যটী দেখিতে এমন সুন্দর যেন শিব-শিরে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে। সহসা ঐ চট্‌পট্‌ শব্দে যাত্রীদল সকলেই উঠিয়া দেখিলেন। অনেকক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া আবার নিদ্রামগ্ন হইলাম। ভোরে ৫টায় মুখহাত ধুইয়া ইষ্ট স্মরণ করিয়া আবার চলিলাম। অলকনন্দার তটের দুই পার্শ্বে শ্যামল শস্যক্ষেত্র-গুলি শোভা পাইতেছে। পাহাড়ি স্ত্রী ও পুরুষগণ কৃষিকার্য্য করিতেছে। সোনালা চটী ছাড়াইয়া আমরা জয়কাণ্ডী চটি আসিলাম। আবার এই স্থান হইতে ৮ মাইল আসিয়া কর্ণপ্রয়াগ পৌঁছাইলাম। এই স্থানে অলকনন্দার সহ কর্ণগঙ্গার বা পিণ্ডর গঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে। সঙ্গম ঘাটে আসিতে বেলা এগারটা হইল। যাত্রীদল প্রথমেই মোট্‌ঘাট একটা অশ্বত্থ গাছের নিকট রাখিয়া স্নান করিতে গেল। সঙ্গম ঘাটে আসিতে একটী বাঁধান অশ্বত্থ গাছ আছে, আমরা ঐ অশ্বত্থমূলে মোট গাঁটরি নামাইয়া স্নান করিতে গেলাম। এস্থানের জল বেশ স্থির। গভীরতাও তত নাই, স্রোতও কম। আমরা জলে নামিয়া বেশ আরামেই স্নান করিলাম; স্নানান্তে ঘাটে বসিয়াই সন্ধ্যা আহ্নিক ও শিব পূজাদি সমাপ্ত করিয়া কাণ্ডিতে গিয়া উঠিলাম। এখান হইতে ২ মাইল খাড়া উচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিয়া তবে চটী পাওয়া যায়। গোলাপসিং আমায় লইয়া মহারাজ চটীতে উপস্থিত হইল। বিখ্যাত দানবীর কর্ণের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এখানে কর্ণকুণ্ড একটী মহাতীর্থ। ঐ স্থানে বসিয়া

মহাত্মা কর্ণ শত শত সুবর্ণ মন্দির ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। কর্ণের দানমাহাত্ম্য জগতে চিরপ্রসিদ্ধ। এখানে দশ পনর খানা দোকান, চটী ও কমলী বাবার ধর্ম্মশালা আছে। এই সর্ব্বত্যাগী সাধুর কৃপায় বদরীনারায়ণের পথে ৪০টী ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে এবং পথের স্থানে স্থানে জলশালাও আছে। সাধু সন্ন্যাসী ও দীন দরিদ্র যাত্রীগণ কমলী বাবার কৃপায় অক্লেশে বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া আসে। এখানেও ডাকঘর, থানা পুলিশ, হাঁসপাতাল সমস্তই আছে! কর্ণপ্রয়াগ বেশ স্থান। তবে ঝরণা নিকটে নহে, নদীও বহু নিম্নে, এজন্য জল কষ্ট আছে। আমি গোলাপ সিংকে এক আনা পয়সা দিয়া এক কলসী জল আনাইয়া লইলাম। এখানে পুরী, মিষ্টান্ন, দুধ, পেঁড়া সবই মিলে। আমরা পাকাদি করিয়া আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। পাণ্ডা বলিলেন,—"এই কর্ণ প্রয়াগ হইতে দুটী রাস্তা দুদিকে গিয়াছে। একটি রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে; সেই রাস্তা পিণ্ডরগঙ্গার ধারে ধারে রামনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয় রাস্তায় অলকনন্দার ধারে ধারে আসিয়া রুদ্র-প্রয়াগ পৌঁছান যায়। তথা হইতে শ্রীনগর দেব-প্রয়াগ ইত্যাদি হইয়া যে রাস্তা দিয়া আমরা বদরী নারায়ণ গমন করিয়া ছিলাম ঐ রাস্তা ধরিয়া হরিদ্বার আসিয়া পৌঁছান যায়।"

গৌরবাবু আমাদের লইয়া রামনগর গিয়া ট্রেন ধরিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। সকলের আহারাদি সমাপন হইলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াই গৌর বলিল,—"মা ঠাকরুণ বেরিয়ে পড়ি, আর বিলম্ব করিয়া লাভ নাই।" গৌরের মনটি ভাল, উন্নত ও দয়াপূর্ণ। আমরা

যে যে চটীতেই আশ্রয় লইয়াছি, গৌর সেই চটীতেই দীন দুঃখীকে দান ও সাধু সন্ন্যাসীকে ভোজন দিয়াছেন। কর্ণপ্রয়াগ হইতে যাত্রা করিয়া সাড়ে তিন মাইল আসিয়া সেমেলিচটী আসিলাম। এখানে দু তিন খানি দোকান আছে। চণ্ডিকাদেবীর মন্দির আছে। তৎপরে আটাগাড় নদীর ধার দিয়া সড়ক রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একটু বিশ্রাম করিয়া আবার চলিলাম। সেমেলি হইতে দুই মাইল আসিয়া শিরোলিচটী আসিলাম। আর বেলা নাই সন্ধ্যা সমাগত। পশ্চিম গগন লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আজ আমাদের এই স্থানেই থাকিবার ব্যবস্থা হইল। রাত্রে হালুয়া দুধ খাওয়া গেল ও ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। আবার ভোর ৪টা বাজিতেই মুখ হাত ধুইয়া "জয় বদরীবিশাল" বলিয়া বাহির হইলাম। কত নদ নদী, কত শত গিরি নির্ঝরিণী উপত্যকা দেখিতে দেখিতে, স্বভাবের নব নব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে, আনন্দে পথ চলিতে লাগিলাম। এখান হইতে আমরা তিন মাইল হাঁটিয়া ভটোলিচটী আসিলাম। ভোরে চলিতে কি আহ্লাদই হইত! দেখিতাম কোন স্থানে রাশি রাশি বনফল ফুটিয়া আছে। কোথাও পক্ষীদল বৃক্ষশাখোপরি মধুর কূজন করিতেছে। কোথাও নির্ঝরিণী ঝর ঝর রবে পতিত হইতেছে। কোথা বা অত্যুঙ্গ শৈলশিখর মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া আছে। ভগবানের রাজ্যে কোথাও অপূর্ণতা নাই, সকলই পরিপূর্ণ।

ভটোলি হইতে ৪ মাইল দূরে আদি বদরীনাথ দর্শন হয়। একটী বৃহৎ মন্দির মধ্যে আদি বদরীনাথ অধিষ্ঠিত। এটী ভগবানের যোগ-

মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির ভঙ্গী বড় মনোহর। নর-রূপধারী নারায়ণ যোগাসনে ধ্যান নিমীলিত নয়নে বসিয়া আছেন। দেবতারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। উপরিভাগে বৃষধ্বজ শঙ্কর গৌরীকে যোগতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। দেবী তন্ময় হইয়া শঙ্করের নিকট শ্রবণ করিতেছেন। পদতলে ভক্তদ্বয় স্তব করিতেছে। অতি সুন্দর মূর্ত্তি! চিত্রের ভাবও অতি অপূর্ব্ব। সম্মুখের আর একটী ঘরের মধ্যে হর-গৌরী কার্ত্তিক-গণেশের মূর্ত্তি আছে; গৃহের এক পার্শ্বে নন্দীশ্বর দাঁড়াইয়া হরপার্ব্বতীর তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতেছেন। এই মন্দির দেখিলে বোধ হয়—ইহা বহু পুরাতন মন্দির। নিকটে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্ন মন্দির আছে, দেবদেবীর মূর্ত্তি তাহাতেও আছে। এই স্থানে স্নানপূজা সমাপন করিয়া আহারাদি করা গেল। আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আদি বদরী হইতে সাড়ে চারি মাইল আসিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জোঁকাপানী চটীতে পৌছিলাম। এখানেই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হইল। গৌরের ভগ্নী ও মাসি ও ঊষার মা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করিতেন। আমার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে আমার আর একটী সঙ্গিনী এসেছিলেন। তাঁহার রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায় সময় সময় আমায় অস্থির করিয়া তুলিত। এদিককার পথে সর্ব্বত্র ঝরণার জল সুলভ নহে, অগত্যা পথশ্রমে তৃষ্ণাতুর হইয়া কমলী-বাবার জলশালায় গিয়া শীতল জল আকণ্ঠ পান করিতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে পথশ্রান্ত পথিককুলের পিপাসা অনিবার্য্য। যে সকল স্থানে ঝরণা বা নদী নাই, সেই সেই পথের মধ্যে মহাত্মা কমলীবাবার জলশালা আছে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিকগণ সেই সাধুর পুণ্য বলেই সর্ব্বত্রই পিপাসার

জল পাইতেছে। রাত্রে মুদির নিকট আটা, ঘি আলু লইয়া পরোটা ও আলুর তরকারি করা হইল ও সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া আহারান্তে নিদ্রা আসিল। প্রাতে উঠিয়া ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া পথ চলিলাম। গোলাপ সিং আমার সঙ্গী, কেন না গৌর ও তাঁর ভগ্নী সবল শরীর, তাঁহারা প্রতিদিনই আমাদের অগ্রে চটীতে পৌছাইতেন ও আমাদের জন্য স্থান রাখিতেন। আমি ধীর পদে যাইতাম। কখন কাণ্ডিতে যাইতাম কখন হাঁটিতাম। গোলাপ সিং বলিল—"আজ বহুত চড়াই হোগা।" আমি বলিলাম—"বাবা তোমার কল্যাণেই চড়াই উত্তীর্ণ হইব।" সে এ কথায় বড় খুসি হইয়া আমায় প্রণাম করিয়া বলিল—"মাইজী আপকো প্রতাপসে হম পহাড় উঠায় নে শক্তা" আমি বলিলাম "বদরীবিশালের কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হও"। চড়াই রাস্তা পার হইবার জন্য কাণ্ডিতেই উঠিলাম। জোঁকাপানী হইতে আরম্ভ করিয়া কালামাটী চটি তিন মাইল বিষম চড়াই। পথের ধারে বিজন বন। তাহার পর আরও তিন মাইল আসিয়া গোয়াড়চটী আসিলাম। তাহার পর আরও দেড় মাইল আসিয়া ধুনার ঘাট পৌছান গেল। এখানে চটীর নিকটে ঝরণা ও রাম-গঙ্গা আছেন। কএকখানা দোকানও আছে। বেলা অধিক হইয়াছে। কাণ্ডিওয়ালারা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। সকলেই স্নান ভোজনের চেষ্টায় গেল। আমিও স্নান পূজা করিতে গেলাম এবং পাকাদি করিয়া আহারের পর পাণ্ডার ছড়িদার বিশ্বনাথ বলিল, "মাইজী, এখান হইতে মেলচৌরি পাঁচ মাইল মেলচৌরি গিয়াই কাণ্ডিওয়ালাদের বিদায় দিতে হবে, এবং সেখানে অন্য সোয়ারি ঝাম্পান বা কাণ্ডি বা ঘোড়া লইতে হবে ও

মোট বহিবার কুলিও করিতে হবে। এ স্থানের এইরূপ প্রথা যে গাড়োয়াল জেলার কাণ্ডি বা ঝাম্পান বা কুলি গাড়োয়াল ছাড়িয়া আলমোরা জেলায় যাইবে না। অগত্যা সকল যাত্রীকে মেলচৌরি পর্য্যন্ত আসিয়া কুলি ও কাণ্ডিওয়ালাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া নূতন কুলি ও কাণ্ডি লইতে হইবে।” পাণ্ডার নিকট এই কথা শুনিয়া আমার মনটা বিষাদে পূর্ণ হইল। মনে হইল প্রভুভক্ত গোলাপ সিং এই দেড়মাস আমার সঙ্গে থাকিয়া পুত্রের ন্যায় আমায় সেবা যত্ন করিতেছে। সে চলিয়া গেলে কেবা আমায় দেখিবে? কেই বা আহারাদির যোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু ভগবান্ যাহা করিবেন তাহাই মঙ্গল। কাল ইহাদের বিদায় দিতেই হইবে।

উত্তরাখণ্ডের পথে সর্ব্বত্রই চাউল মহার্ঘ। মোটা চাউল ছয় আনা আট আনা সের। ভাল চাউল বার আনা, দশ আনার কম নয়। চাউল অপেক্ষা আটা সুলভ, ঘি ২৷৷৹ টাকা, তিন টাকা সের, তবে ঘি মন্দ নয়। হরিদ্বার হইতে হিমালয়ের রাস্তায় সর্ব্বত্রই ছোলাভাজা পাওয়া যায়। চটীর মধ্যে দুধ ও জিলাপি, পুরি স্থানে স্থানে মিলে। চাউল, ডাল, আটা, ঘি, লবন, শর্করা, আলু সর্ব্বস্থানেই পাওয়া যায়। আজ আমাদের এই স্থানেই থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে চটীর চারিদিক একবার বেড়াইয়া সায়াহ্নে কৃত্যকর্ম্ম পূজাজপ করিয়া দোকান হইতে জলখাবার আনিয়া খাইয়া শয়ন করিলাম। পার্শ্বে মাড়োয়ারি পাঞ্জাবি রমণীগণ বেশ মধুর স্বরে ভজন গাহিতেছে শুনিয়া আনন্দ হইল। প্রত্যেক চটীতেই এদের ভজন হইত। আমার কলিকাতার একদল কুটুম্বিনী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহ সরকার

গোমস্তা দাসদাসী ছিল এবং একজন প্রৌঢ়বয়স্ক কথক আসিয়াছিলেন। তিনি চটীতে চটীতে মধ্যে মধ্যে কথকতা করিতেন। কোন দিন ধ্রুব চরিত্র, কোন দিন প্রহ্লাদ চরিত্র ইত্যাদি ভাগবত কথা হইত। জীবনে এমন সুখের দিন আর হয় নাই, আর হইবেও না। কেমন আনন্দে বৃক্ষতলে শয়ন ও প্রান্তরের মধ্যে যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন, আর মনের মধ্যে অহরহ তাঁহার ধ্যান এবং ভজন কীর্ত্তন নামগানের আনন্দ। মনে হইত চিরদিন এইরূপ ভগবদ্-অনুরাগে পথে পথে বেড়াইয়া সাধু সন্ন্যাসীগণ কেমন আনন্দ ভোগ করেন। এখানে সংসারের মলিনতা নাই। ভজন শুনিতে শুনিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল। আবার ভোর ৫টায় উঠিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া রাস্তায় বাহির হওয়া গেল। ৫ মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে ধারে মেলচৌরি আসিয়া পৌছান গেল। তখন বেলা ৯টা। পাহাড়ের উপর একটী চটিতে গৌর বাসা লইলেন। এখানে দেখিলাম অনেক শোয়ারি, ঘোড়া, ও ঝাম্পান রহিয়াছে, কুলিও আছে। কিন্তু কাণ্ডি মোটেই নাই। এই স্থানেই গাড়োয়াল জেলার শেষ হইল। তাহার পর কুঁমায়ুন জেলা সুরু। আমাদের তিন জন কাণ্ডিওয়ালা গোলাপ সিং ধনসিং ও রতিসিং ও দুই জন বোঝাওয়ালা প্রতাপসিং ও তাহার সহচর এবং পাণ্ডার ছড়িদার বিশ্বনাথ সকলেই আসিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল। কেদারনাথের পাণ্ডা বিশ্বনাথ সুকুল গুপ্তকাশির পথে বিদায় লইয়াছেন। বদরীনারায়ণের পাণ্ডা দর্শন করাইয়াছেন মাত্র তবে ঐ পাণ্ডার ছড়িদার বিশ্বনাথ পাণ্ডা আমাদের রাস্তা দেখাইয়া মেলচৌরি পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। গোলাপসিংকে বিদায় দিতে

আমার নয়নে জল আসিল। আমি তাহার প্রাপ্য সব টাকা চুকাইয়া দিলাম। ৩৲ টাকা বকসিস দিলাম, একখানি নূতন বস্ত্র ও একটী গেঞ্জী দিলাম। গোলাপ সিং ভক্তিপূর্ণ চিত্তে আমায় প্রণাম করিয়া, "মাইজী আশীষ দি জীয়ে ; হামারা সব কসুর মাপ কি জীয়ে।" আমি সজল নয়নে বলিলান, "বাবা, তোমার কসুর বা ত্রুটি কিছুই নাই, তোমারি কল্যাণে আমার দর্শন হইয়াছে।" এইরূপ গৌরও কাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালাদের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া বকসিস দিয়া বিদায় করিলেন। তখন আবার সোয়ারি বাহক খুঁজিতে হইল। বিশ্বনাথ পাণ্ডাকে আমি একখানি নূতন বস্ত্র, একটী টাকা দিলাম। তিনি গৌরের পাচকতা করিতেম। গৌর ১৫।২০ টাকা দিল।

মেলচৌরি হইতে রামগঙ্গার তীর দিরা পাকা সড়ক পাঁচমাইল বরাবর রামনগর গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ঝরণা আছে। মেলচৌরিতেই গাড়োয়াল জেলা শেষ হইয়া কঁমায়ূন জেলা আরম্ভ হইয়াছে। এখনকার এক বিষম ব্যবস্থা এই যে গাড়োয়ালের কুলি মজুর ঝাপান কাণ্ডি কেহই কঁমায়ুন জেলায় আসিবে না। ইহাই রাজার হুকুম। অগত্যা এখান হইতে আবার সমস্ত কুলি ঝাম্পান কাণ্ডি লইয়া রামনগর যাইতে হইবে। এখানকার কুলি এক মণে ৫৲ টাকা লইবে। কিন্তু কাণ্ডি ঝাম্পানের ভাড়া অত্যন্ত বেশী। ঝাম্পান্ ৪০ টাকা ও কাণ্ডি ৩০ টাকার কমে যাইবে না। গৌর ও তাঁর ভগ্নী ত বরাবর হাঁটিয়াই গিয়াছেন, হাঁটিয়াই আসিতেছেন। তাঁহারা একটা কুলি লইয়া হাঁটিয়াই রামনগর যাইবেন, কিন্তু আমিত হাঁটিতে পারিব না। নিকটে অত টাকাও নাই। গৌর বলিলেন মা ঠাকুরুন

আপনি দুই দিন একটু কষ্ট করিয়া হাঁটিয়া চলুন, আমি শিরিকোট নামক স্থানে গরুর গাড়ি করিয়া দিব। অগত্যা সম্মত হইলাম। এখান হইতে কুলি ও কাণ্ডিওয়ালা বা ঘোড়া রামনগর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিবে। তার পর রামনগর হইতে মুরাদাবাদ গিয়া অন্য ট্রেনে মোগলসরাই বা বেনারস যাইতে হইবে। অগত্যা সকলেই হাঁটিয়া চলিলাম। এখান হইতে পাণ্ডুয়াখাল নামে চটী ১ মাইল। তাহার পর পাঁচমাইল উৎরাই রাস্তা নামিয়া আমরা চৌমুটিয়া চটী আসিলাম। এ রাস্তাটী সুন্দর সমতল। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষও আছে। আরও দুই তিনটী চটী পার হইয়া আমরা চৌখুটীয়া চটিতে আসিয়া স্নান আহারের ব্যবস্থা করিলাম। এখান হইতে দুটী রাস্তা। একটী রামনগর ও একটী কাটগুদামে গিয়াছে। তবে রামনগর রেল হইয়া আর কোন যাত্রীরা কাঠগুদাম যাইতেছে না। আমরাই এই পথে যাইতেছি। স্নানপূজা সমাপন করিয়া খিচুড়ী করিয়া আহার করিলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া আবার সকলেই চলিলেন। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে চলিলাম। আমার পায় বাতের বেদনা, এজন্য বেশী চলিতে পারি না। ছয় মাইল আসিয়া আমরা মাসিচটী আসিলাম, রাত্রে এই চটীতেই আহারের ব্যবস্থা হইল। মুদির নিকট আটা ঘি লইয়া রুটী করিয়া আহার করিলাম। রাত্রে সুনিদ্রারও অভাব হইল না। মানুষ যখন জগতের সকল চিন্তা হইতে আপনাকে অবসর দেয় তখন তার প্রকৃত শান্তিলাভ হইয়া থাকে। আবার প্রাতে উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া যাত্রা করা গেল। ফিরিবার সময়ও পাণ্ডার ছড়িদার বিশ্বনাথ নামে একটা লোক

আমাদের পথ প্রদর্শক রূপে রামনগর পর্য্যন্ত সঙ্গে চলিল। কেদারের পাণ্ডা কেদার দর্শন করাইয়া নিজগৃহে ফিরিয়াছেন। বদরীনারায়ণের পাণ্ডা বদরীনাথদর্শন করাইয়া আমাদের বিদায় দিয়াছেন, তবে সঙ্গে একটী তাঁর গোমস্তা দিয়াছেন। মাসিচটী হইতে ভোরে উঠিয়া মুখ ধুইয়া গমনের জন্য সকলেই প্রস্তুত হইলেন। সকলেই স্বদেশ গমনের আনন্দে উৎসাহে দ্রুতপদে চলিতেছেন। আমি সকলের পিছনে পড়িয়াছি। দুই ঘণ্টা হাঁটিয়া মাসিচটী হইতে ৪ মাইল বুড়াকেদারে আসিলাম। বুড়া কেদারের মন্দিরটী অতি পুরাতন— প্রস্তর নির্ম্মিত। আগে এখানে চটী ছিল এখন কেহই নাই। বুড়া কেদারের মন্দিরটী শূন্য পরিত্যক্ত ভাবে পড়িয়া আছে। মন্দিরমধ্যে একটী শিবলিঙ্গ আছেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেখানে একটু বসিয়া বিশ্রাম করিলাম। পরে আরও ৪ মাইল হাঁটিয়া নালচটী আসিয়া পৌছিলাম। এখানে আহারাদির ব্যবস্থা হইল। আহারাদির কিছুক্ষণ পরেই বৈকালে আবার ৪ মাইল হাটিয়া ভখিয়াসেন নামক চটী আসিলাম। এই স্থানে চন্দ্রভাগার সহ রাম-গঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই চটীতে আসিলাম। দেখিলাম চটীর নিম্নেই চন্দ্রভাগা নদী মন্থর গমনে ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হইতেছেন। চটীর নিকটবর্ত্তী দুচা'রটী আম্রবৃক্ষও আছে। স্থানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে। রাত্রে সন্ধ্যা বন্দনা সমাপনান্তে হালুয়া খাইয়া শয়ন করা গেল। আবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পথে বাহির হইলাম কিন্তু গমনের সময়ে যে আনন্দ উচ্ছ্বাস বহিয়াছিল এখন আর সে আনন্দ নাই।

আমি দক্ষিণাপথেও কতকদূর ভ্রমণ করিয়াছি। কত স্থানে ঘুরিয়াছি কিন্তু উত্তরাখণ্ডের ন্যায় এমন রমণীয় স্থান বোধ হয় আর কোথাও দেখি নাই। এখানে যে দিকে চাও প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য। শুধুই আকাশস্পর্শী শৈলমালা ও রজত রেখাময়ী গঙ্গার মনোহারিণী ছবি। বন পুষ্পের মধুর সৌরভ। পক্ষীর ললিত কূজনে যেন প্রাণে আনন্দ ধারা ঢালিয়া দিতেছে। এখানে রাজধানীর জনতা নাই। বিপণি সজ্জাও নাই। গাড়ী ঘোড়ার শব্দও নাই। শুধু যেন বনভূমি ও কানন পথটী আলেখ্যের মত বোধ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে নির্ঝরিণী আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদুমৃদু প্রবাহিতা হইতেছে। আমরা মেলচৌরি হইতে দুইজন কুলি লইয়া সকলেই হাঁটিয়া চলিতেছি, সম্মুখে রামগঙ্গার পুল। এই কাঁচা পুলটি পার হইয়া আমাদের ঐ সম্মুখের উচ্চ পার্ব্বত্য পথে উঠিতে হইবে। ঐ পথটি নদীগর্ভ হইতে একবারে পাহাড়ের গাত্রে সোজা উঠিয়াছে। পথটি দেখিয়াই আমার চক্ষু স্থির হইল। কিরূপে এই দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে উঠিব ভাবিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলাম। এ পথে যাত্রীদল কেহ কাহারও সাহায্য করিতে পারে না, সকলেই স্ব স্ব প্রাণ লইয়া অস্থির। আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে দুই চারি পা অগ্রসর হইলাম। ইতিপূর্ব্বে যে সকল চড়াই রাস্তা উঠিয়াছি গোলাপ সিংহের বাহুবলেই উঠিয়াছিলাম। এখন কি করিয়া এ পথে উঠিব তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের সকল যাত্রীই অগ্রসর হইয়াছে, এখন মধ্যে মধ্যে দু চারিজন হিন্দুস্থানী যাত্রী যাইতেছে। আমি কি উপায়ে এ রাস্তায় চলিব তাহাই

ভাবিতেছি। কিন্তু ভগবানের অসীম দয়ায় দেখিলাম একটি তরুণ বয়স্ক পাহাড়ি বালক ঐ পথ দিয়া উপরে উঠিতেছে। আমি বলিলাম, আমায় তুমি হাত ধরিয়া উপরে লইয়া চল আমি তোমায় কিছু পয়সা দিব। সে আনন্দিত হইয়া স্বীকার করিল। তখন তাহার সাহায্যে আমি ধীরে ধীরে সেই পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম। আমি তাহাকে চারি আনা পয়সা দিলাম, বালক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে হাসিয়া চলিয়া গেল। পরে দুই মাইল হাঁটিয়া আমরা শিরকোট্ আসিলাম। গৌর ও তাহার ভগ্নী এই চটীতে কিছু পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আমি পথশ্রমে বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। চটীতে বসিয়া একটু শ্রান্তিদূর হইলে বলিলাম, গৌর ! একখানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া দাও আমি চলিতে অসমর্থ। গৌর পাণ্ডার ছড়িদারকে ডাকাইয়া গরুরগাড়ি খুঁজিতে বলিল। ১২ টাকা ভাড়ায় একখানি গরুরগাড়ি রামনগর পর্য্যন্ত যাইতে রাজি হইল; আমি বাঁচিলাম। গৌরের ভগ্নীর শরীর কিছু অসুস্থ হওয়ায় সেও গরুর গাড়িতে আসিবে স্থির হইল। আমরা দুই জনে গাড়িতেই উঠিলাম। গৌর অগ্রবর্ত্তী হইল, তাহার মাসিমা দুজন হাঁটিয়া চলিলেন। যাইবার সময় গৌর গাড়োয়ানকে বলিয়া দিল টোটাচটী সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌঁছাইয়া দিবে, আমি সেখানে থাকিব। গাড়োয়ান স্বীকার হইল। আমরা গাড়িতে শয়ন করিলাম। এখানে পাহাড়ের উপর ছোট ছোট গ্রামগুলি বড় সুন্দর। পাহাড়িদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহগুলির চারিদিকে গো মহিষ ছাগ সকল চরিতেছে। সুন্দর সুন্দর বালকগণ গাভী চরাইতেছে, মেষ চরাইতেছে। পথের

দুই ধারে প্রচুর যব গোধূম আদি পক্ক শস্যগুলি দেখা যাইতেছে। ঐ স্থানের ভূমিও খুব উর্ব্বরা বোধ হইল। রাস্তার মধ্যে মধ্যে পাহাড়ি রমণীরা বিচিত্র ঘাঘরী পরিয়া বেণী এলাইয়া মাথায় কানে ফুল পরিয়া দলে দলে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে। এদের রূপের ছটায় পথ আলো করিয়াছে। শিশুগুলি কিন্নর শিশুর ন্যায় সুশ্রী। আরক্ত গোলাপ গণ্ডের হাস্যটী কি সুন্দর! বালিকাগুলি দেব-কন্যাদের মত মনে হয়। আমরা ৩ মাইল পরে বাসোট চটী আসিলাম। আরও তিন মাইল পরে লানচটী আসা গেল। এখান-কার গরুর গাড়ি মন্দ নয়, দুইজন লোক পাশাপাশি শয়ন করিয়া যাইতে পারে। গাড়ির বলদ গুলি খুব বলিষ্ঠ। তবে পাহাড়ের উপর দিয়া এই রাস্তা—একটু অসাবধান হইলেই গরুর গাড়ি খাদে পড়িতে পারে। গাড়ি ঘণ্টায় দুই মাইল চলে। লানচটি হইতে গুজরচটি তিন মাইল। এস্থানটী একটী গাড়িঘোড়ার প্রসিদ্ধ আড্ডা। এখান হইতে ৫০।৬০ খানা গাড়ি মাল লইয়া রামনগর যাইতেছে। এটী খুব বড় চটী। সারি সারি দোকান—কেহ রাঁধিতেছে, কেহ খাইতেছে ; গাড়োয়ানদল বসিয়া ভজন গাহিতেছে। চিড়ামুড়ি দই দোকানে অনেক দেখা গেল। আমাদের গাড়োয়ান প্রাণপণে গাড়ী চালাইয়া আরও ৪।৫টা চটী পার হইয়া কালাপানি নামক চটীতে আসিল। তখন বেলা প্রায় ৫টা—এখান হইতে টোটা আম চটী ছয় মাইল। গৌর বাবুর ভগ্নী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া বলিলেন আমি হাঁটিয়া যাব, সন্ধ্যার সময় গাড়োয়ান বেটা কোথা লইয়া যাবে তার ঠিক নাই—এই বলিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া উর্দ্ধ

শ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহাকে বারম্বার গাড়ি হইতে নামিতে নিষেধ করিলাম।

তিনি কোনমতে নিরস্ত হইলেন না। উন্মত্তের ন্যায় বেগে ছুটিতে লাগিলেন। আমি ভাবিত হইলাম যে, সন্ধ্যার সময় সে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারাইয়া ফেলিলে বিষম বিপদ ঘটিবে। আমি একাকী নিরুপায় হইয়া গাড়িতে বসিয়া রহিলাম। আমার কাছে ৩০টী টাকা মাত্র ছিল। একবার ভাবিলাম এই সন্ধ্যাকালে আমায় একাকী দেখিয়া গাড়োয়ানটা যদি বনের মধ্যে লইয়া গিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লয়, তবে কি হইবে? আমাদের সমস্ত দিনটা গোযানে আসিতে আসিতে রাত্রি হইয়া গেল। ক্রমে গোধুলির ললাটে তারকা ফুটিল সন্ধ্যার হিমশীতল বায়ুতে শরীর কম্পান্বিত করিয়া তুলিল। চতুদ্দিকে পর্ব্বতমালা মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য পথ। অন্ধকার ক্রমে প্রগাঢ় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক জন মানব বিহীন। শুধু শকটচালক বলী বর্দ্দদুটীকে চালনা করিতেছে, যানের ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাইতেছে। আমি একাকী ভীতিবিহ্বল নয়নে গাড়িতে বসিয়া রহিলাম। ২ ঘণ্টা পরে আমাদের গোযান টোটা আমচটী আসিয়া পৌঁছিল। চতুর্দ্দশীর চন্দ্র তখন মাথার উপর দেখা দিতেছিল। স্তব্ধ বনানীর মধ্য দিয়া অস্ফুট ঝিল্লিরব শোনা যাইতেছিল। বৃক্ষ শাখায় জোনাকী আলোক গুলি মিট্ মিট্ করিতেছিল—মনে হইতেছিল যে শাখায় শাখায় যেন দীপ জ্বলিতেছে। যখন টোটা আম চটী আসিলাম তখন রাত্রি ৯টা। গৌরবাবু আমার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। আমার সঙ্গিনীরা তখন প্রায়

অনেকেই নিদ্রিতা। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। গাড়িতে আলোও নাই, চতুর্দ্দিকে পাহাড়, রাস্তাঘাট কিছুই জানি না। অদৃষ্টে যা থাকে হইবে বলিয়া চুপ করিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে লাগিলাম। তিনিই বোধ হয় গাড়োয়ানের মাথায় সুবুদ্ধি দিলেন। গাড়য়োনটা অত্যন্ত বকিতে বকিতে পরিশ্রান্ত বলদগুলিকে পিটিতে পিটিতে রাত্রি ১০টার সময় টোটা আম-চটী পৌছিল। আমি সন্ধ্যা হইতে ৪ ঘণ্টা নিতান্ত ভীত হইয়া একাকী গাড়িতে বসিয়া ছিলাম। রাস্তা ত জনমানব হীন। দৈত্যের ন্যায় প্রকাণ্ড পাহাড়গুলি মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। আর নৈশ অন্ধকারময় আকাশপটে শুধুই নক্ষত্র-মালা ফুটিয়া রহিয়াছে এবং পথ পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে আলেয়ার আলোকের ন্যায় এক একটা সুদূর প্রান্তরস্থিত কুটীরে আলোক দৃষ্ট হইতেছে। আমার কতকালের পুণ্য ছিল তাই প্রাণে প্রাণে টোটা আমচটী পৌছিলাম। পৌছিয়া বিষম উদ্বিগ্ন ভাবে চটীতে গিয়া বলিলাম "গৌর! দুর্গা এসেছে কিনা শীঘ্র বল।" সে বলিল, "মা ঠাকরুণ এসেছে"। আমি তাহাকে খুব ভৎর্সনা করিয়া বলিলাম "বাছা তোমাদের একি দুঃসাহস। তুমি একাকী স্ত্রীলোক হইয়া এই রাত্রিকালে পাহাড়ি রাস্তায় কেন আসিলে মা! সে কাঁদিতে লাগিল। গৌরবাবু গাড়োয়ানকে অত্যন্ত গালাগালি দিলেন। গাড়োয়ান করজোড়ে বলিল "বাবু বিশ মিল রাস্তা, বলদ চলনে নেছি শেকতি"। অনেক বকাবকির পর সকলে শয়ন করিল। আবার দেখি ভোরে উঠিয়াই গাড়োয়ান ডাকাডাকি করছে। আবার উঠিয়া কাপড় পরিয়া গাড়িতে বসিলাম। গৌরের ভগ্নীও

বসিল। শিরকোট হইতে তিন মাইল পরে বাসোট চটী, আরও তিন মাইল পরে গোয়ানখানা ও লালচটী। লালচটি হইতে ছয় মাইল পরে গুজরবাটী ; এখানে গরুর গাড়ির প্রধান আড্ডা। এই স্থান হইতে ২৩ মাইল পরে সুপ্রসিদ্ধ রাণীক্ষেত নামক স্থান আছে। সেখানে সরকারি ছাউনি বা সেনা বাস আছে। ঐ স্থানের আরও কিছু দূরে ভীমতাল। পাণ্ডার মুখে এ কথা শুনিলাম। আমরা শিরকোটে গরুর গাড়িতে আসিয়া কালাপানি চটী ও টোটা আমচটী উত্তীর্ণ হইয়া বামদিকের পথ দিয়া উৎরাই রাস্তা দিয়া ৪ মাইল পরে কুমরিয়া চটি আসিলাম। কুমরিয়া হইতে কৌশল্যাগঙ্গা বা কুশিনদী পার হইতে হইবে। নদীতে জল বেশী নাই, কিন্তু স্রোত আছে। জুতামোজা খুলিয়া খুব সাবধানে সকলেই নদী পার হওয়া গেল। আমরা পদব্রজে নদী পার হইলাম। গাড়োয়ানও আমাদের নামাইয়া গাড়ি লইয়া নদীপার হইয়া এপারে আসিল। সম্মুখে একটা ছোট চটী দেখিয়া আমরা এই স্থানেই স্নান আহারের ব্যবস্থা করিলাম। চটী একবারে পাহাড়ের মাথায়।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আহারাদি করিবার আয়োজন করিলেন। এখানে আলুও মিলিল না। বড়ি দুটী ছিল, বড়ীর ঝোল ও দুটী ভাত মুখে দিয়াই গরুর গাড়ীতে উঠিলাম। ছয় মাইল আসিয়া গরজিয়া চটী আসিলাম। গরজিয়া হইতে রামনগর ৭ মাইল। গাড়োয়ান প্রাণপণে গাড়ী হাঁকাইয়া সন্ধ্যার পর রামনগর আসিয়া পৌঁছাইল। এদিকে আর তত শীত নাই। বরং একটু গরমই বোধ হইল। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলাম, সুন্দর বৃহৎ পাকা

ধর্ম্মশালা, চারিদিকে বাজার হাট দোকান লোকজন। চরিদিকে আলো জ্বলিতেছে। এখানে লুচি মেঠাই রাবড়ি খাইয়া গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। আজ প্রায় দুই মাসের পর বন জঙ্গল পাহাড় ছাড়িয়া সহরের মুখ দেখিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাস—বড় বড় তরমুজ রহিয়াছে। একটা তরমুজ কেনা হইল। গৌর বলিলেন রাত্রি দশটায় রেল ছাড়িবে। আমরা আহারাদি সারিয়া রামনগর ষ্টেশনে আসিলাম। এ ষ্টেশনটী বেশ বড়—অনেক খাবারের দোকান, পানের দোকান, চারিদিকে গ্যাসের আলো, জলের কল। আমরা সুদূর হিমালয় হইতে যেন কত যুগের পর আসিলাম। রাত্রি দশটায় গৌর আমাদের লইয়া ট্রেনে উঠিলেন। ২ ঘণ্টা বাদে গাড়ি মুরাদাবাদ আসিল। আমাদের মুরাদাবাদে নামিয়া অন্য ট্রেনে উঠিতে হইল। সমস্ত রাত্রি ট্রেণে কাটিল। প্রাতে বেরিলি আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে টাঙ্গা করিয়া ধর্ম্মশালায় গেলাম। সেখানে স্নান করিয়া কিছু পুরী কিনিয়া খাইলাম। পরদিন প্রাতে বারটার সময় মোগলসরাই আসিয়া পৌঁছিলাম। মোরাদাবাদ হইতে যাত্রীগণ আপন আপন দেশ অভিমুখে গমন করেন।

এক্ষণে বদরিকা যাত্রীদের প্রতি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের দেশের যে সকল প্রধান প্রধান তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে বদরিকা তীর্থ সর্ব্বপ্রধান তীর্থ এবং এই তীর্থ দুর্গম পার্ব্বত্য পথ দিয়া যাইতে হয়। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা এই পথ অনেক সুগম হইয়াছে বলিতে হইবে। এক্ষণে দড়ির ঝোলার পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে লোহার পুল হইয়াছে। অতি দুর্গম ও কষ্টকর পথ হইলেও এ স্থানের

রাস্তায় কোন হিংস্র জন্তুর ভয় নাই। এবং চুরি ডাকাতিরও আশঙ্কা নাই। পাহাড়িরা প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী ও সরল। যাত্রীদের নিকট প্রবঞ্চনা করিয়া কখনই কিছু লয় না, বরং প্রভুর কার্য্যে ইহারা প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকে। উত্তরাখণ্ড ভ্রমণে বাহির হইতে হইলে গরম কাপড় কিছু সঙ্গে থাকা দরকার। শীতপ্রধান দেশে গরম কাপড়ের বিশেষ আবশ্যক। এ স্থানের জল বায়ুও স্বাস্থ্যকর। তবে যাত্রীদের মধ্যে রক্ত আমাশয় রোগ প্রায়ই হইয়া থাকে; এজন্য সঙ্গে কিছু ঈশগ্‌গুল ও মিছরি লইয়া বাহির হওয়া ভাল। প্রত্যহ ঈষগগুল ও মিছরির সরবৎ করিয়া পান করিলে আর আমাশার ভয় থাকে না। আর পাহাড়ী জায়গায় কিছু বেশী ঘৃত ভোজন দরকার। উত্তরাখণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্রই ঝরণার জল পাওয়া যায়; যে যে স্থানে জল নিকট নহে সেই সেই স্থানে কমলী বাবার জলশালা আছে ও বদরী গমনের পথে কমলী বাবার ৪০টী ধর্ম্মশালা আছে এবং দীন দুঃখী যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে কমলী বাবার সদাব্রত খাইতে খাইতে হরিদ্বার হইতে বদরিকা পর্য্যন্ত যাইতে পারেন। এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অতুল কীর্ত্তি চিরদিনই জগতের বক্ষে অমর ভাবে লেখা থাকিবে। বদরী কেদার বহুদূর হিমালয় পদপ্রান্তে অবস্থিত হইলেও পথের শোভা অতি রমণীয়। এই পথে গমন করিতে করিতে সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ আছে, অসংখ্য পবিত্র-সলিলা নদী আছে এবং আমাদের পরম পবিত্র তপস্যাস্থান সকল আছে। এই স্থানেই আর্য্য ঋষিগণ পূর্ব্বকালে তপস্যা করিতেন। এক্ষণে সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে পথের মধ্যে মধ্যে আহার্য্য বস্তুর জন্য মুদির দোকান হইয়াছে এবং

এই দুর্গম হিমালয়ের স্থানে স্থানে হাঁসপাতাল হইয়াছে। এ রাস্তায় চলিতে হইলে দুগ্ধ ঘৃত, ও বলকারক আহার দরকার। এখানে উত্তম আটা ও চাউলও স্থানে স্থানে অতি উত্তম পাওয়া যায়। আমরা শ্রীবদরীনাথ প্রভুর কৃপায় নিরাপদে কাশীধাম পৌঁছিলাম।

উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণকারী একজন মহাত্মা লিখিয়াছেন যে, বদরীনারায়ণ ক্ষেত্রের পরিমাণ পূর্ব্ব পশ্চিমে তিন ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে তাহার অর্দ্ধেক হইবে। এই স্থানের উচ্চতা প্রায় দশ হাজার চারি শত ফিট। ২৩ হাজার ফিট উর্দ্ধে হিমপ্রবাহ। ঐ স্থানেই গঙ্গার উৎপত্তি। এই তীর্থ স্থানের কেন্দ্রবর্ত্তী দেবালয় শঙ্করাচার্য্যের সমকালে নির্ম্মিত। ভারতবর্ষের কালতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে এই দেবালয় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটী হিন্দুরীতি অনুসারে শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ তাম্রমণ্ডিত। গাড়োয়াল বা তিহিরির রাজা এই দেবালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। দেব সেবার জন্য রাজার নিয়োজিত বহুসংখ্যক পূজারি পুরোহিত ভৃত্যগণ আছেন। দেবোত্তর সম্পত্তি ও যাত্রীদের অর্থে দেবমন্দিরের বার্ষিক আয় ৪৮০০০ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে। রাওল উপাধিধারী কেরল-দেশীয় ব্রাহ্মণ প্রধান পুরোহিত। পুরোহিতের মাসিক বেতন ১০০৲ টাকা। প্রতি বৎসর এই বদরিকাতীর্থে ৬০।৭০ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে বদরীনাথ প্রধান তীর্থ। তথায় প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিটি অতি প্রাচীন কালের বিগ্রহ। শ্রীবিগ্রহের মন্দিরটী সুন্দর। মন্দিরের দ্বারদেশ রজত নির্ম্মিত। এই বিগ্রহটী পদ্মাসনে উপবিষ্ট,

ধ্যাননিমীলিত-লোচন, সমাধিমগ্ন। শ্রীভগবান্ যখন বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হয়েন তখন অতি রমনীয় শোভা হয়। পাণ্ডা বলিলেন যে, যে সিংহাসনে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন তাহার মুল্য প্রায় চারিসহস্র টাকা ও শ্রীভগবানের অলঙ্কারাদি ৭।৮ হাজার টাকা মুল্যের। শীতের প্রারম্ভে যখন হিম বর্ষন আরম্ভ হয়, তখন হইতেই অর্থাৎ শরৎ-পূর্ণিমাতে প্রভুর দরজা বন্ধ হয়, আবার চৈত্র পূর্ণিমায় বা বৈশাখী পুর্ণিমার পরে দরজা খোলা হয়। প্রভুর দরজা বন্দ হইবার পূর্ব্বেই ছয় মাসের উপযোগী পুষ্পমাল্য গন্ধ ধুপদীপ নৈবেদ্য সম্ভার সমস্ত মন্দির মধ্যে রক্ষিত হয়। ছয় মাসের উপযুক্ত ঘৃত দীপ জালিয়া দিয়া পুরোহিত দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। ঐ ছয় মাসকাল যোশী মঠেই শ্রীভগবানের পূজাপাঠ ভোগ আরতি সম্পন্ন হয়। এই তুষারময় স্থানের অপূর্ব্ব রমণীয় দৃশ্য দর্শনে হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে।

পরিশিষ্ট।

উত্তরাখণ্ডের প্রধান প্রধান স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইল।

ঐ স্থানগুলির নাম।

হরিদ্বার সত্যনারায়ণ ঋষীকেশ লছমনঝোলা ব্যাস-ঘাট দেব-প্রয়াগ বিল্লকেদার শ্রীনগর রুদ্রপ্রয়াগ লালসাঙ্গী কর্ণপ্রয়াগ নন্দপ্রয়াগ গরুড়গঙ্গা পাতালগঙ্গা বিষ্ণুপ্রয়াগ যোশীমঠ পাণ্ডুকেশ্বর যোগবদরী বুড়া কেদার, শেষধারা হনুমান চটী শ্রীবদরীকাধাম কপালমোচন বসুধারা ব্যাসগুহা সত্যপথ মাতাজী কৈলাসপর্ব্বত মানসসরোবর।

অন্য পথে গেলে যে যে প্রধান স্থানগুলি পড়ে তাহার নাম ঃ—

শ্রী:গাপেশ্বর অনুস্য়াদেবী তুঙ্গনাথ উখীমঠ শ্রীমধ্যনাথ গুপ্তকাশী অগস্ত্যাশ্রম নানাচটী কালীমঠ ত্রিযুগীনারায়ণ সোমপ্রয়াগ চীরবাসা-ভৈরব গৌরীকুণ্ড ভীমসেন ও কেদারনাথ।

হরিদ্বার।

হরিদ্বার ভারতের একটী প্রধান তীর্থ। ইহার আর একটী নাম মায়াপুরী। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে যতগুলি ভৌমিক তীর্থ আছে তন্মধ্যে হরিদ্বার মহাতীর্থ বলিয়া উক্ত। জগতে এই সাতটী তীর্থ ও চারিধাম তীর্থযাত্রীর প্রধান দর্শনীয়। যথা:—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তধা মোক্ষ দায়িকা॥

সকল তীর্থের মধ্যে এই সাতটি তীর্থ মোক্ষপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। হরিদ্বারে গঙ্গাদেবীর অতি মনোহর শোভা দেখিলে মন প্রাণ মুগ্ধ হয়। ব্রহ্মকুণ্ডের পবিত্র সলিলে স্নান করিলে জীবের সমস্ত পাপ রাশি বিধৌত হয়। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের তটোপরি গঙ্গাদেবীর মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে চতুর্ভুজা মকরবাহিনী গঙ্গা-দেবী বিরাজমান। তাঁহার পার্শ্বে ভক্ত ভগীরথ করযোড়ে দণ্ডায়মান আছেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় গঙ্গাদেবীর আরতি হইয়া থাকে। কত শত সাধু মহাত্মাগণ শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া চামর দ্বারা গঙ্গাদেবীকে ব্যজন করিয়া থাকেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বহুযাত্রীদল আসিয়া গঙ্গা বক্ষে ঘৃত-দীপ জ্বালিয়া দেন ও পুষ্পমালা দিয়া থাকেন। হরিদ্বারে অনেক সাধু মহাত্মা বাস করেন। এখানে কএকটি ধর্ম্মশালা আছে—তন্মধ্যে সূরযমল ঝুন ঝুনওয়ালার ধর্ম্মশালাটি খুব বড় ও মহাত্মা ভোলাগিরির ধর্ম্মশালাটিও সুন্দর—গঙ্গাতটের উপর। এ স্থানে দুধ পেঁড়া মিষ্টান্ন লুচি পুরি সমস্তই সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। হরিদ্বার হইতে কনখল ১ মাইল মাত্র। কনখলে গুরুকুল ও ঋষিকুলের দুইটী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম আছে। পূর্ব্বকালের ন্যায় বালকগণ এই ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে থাকিয়া বেদপাঠ ও ধর্ম্মাচারণ শিক্ষা করে। কনখলও একটি বিশেষ তীর্থ কথিত আছে। এইস্থানে দক্ষরাজ শিবের মূর্ত্তি আছে। এই স্থানে দক্ষরাজ কন্যা সতী পতি নিন্দা শ্রবণে যোগ অগ্নিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাণ্ডারা একটি কুণ্ড দেখাইয়া ইহাই দক্ষের

যজ্ঞ কুণ্ড বলিয়া থাকেন। এই স্থানের গঙ্গার নীলধারা প্রবাহিত হইতেছে। কনখলের গঙ্গা স্বল্প পরিসর। ইহাতে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যকুল খেলা করিতেছে। মৎস্যকুলের খেলা দেখিবার জন্য যাত্রীরা ময়দার গুলি জলে ফেলিয়া দেয়—মৎস্যের ঝাঁক ঐ ময়দা খাইবার লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া থাকে।

লছমনঝোলা।

লছমন ঝোলার নাম জগতে চির প্রসিদ্ধ। লছমন ঝোলা পার হইয়া বদরীকেদার দর্শনে যাইতে হয়। পূর্ব্বকালে এই লছমনঝোলার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। এই স্থানে পাহাড়ের নিম্নে গঙ্গা অতি গভীর ও ভয়ানক প্রবাহে ছুটিতেছেন। পূর্ব্বে এই স্থানে দড়ির ঝোলা পুল ছিল। যাত্রীরা ঐ দড়ির উপর পা দিয়া ও মাথার উপরকার দড়ি গাছটি ধরিয়া অতি কষ্টে পার হইত। অনেকে মাথা ঘুরিয়া গঙ্গার ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইত। কিন্তু দানবীর মহাত্মা সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালার প্রসাদে সেই দড়ির ঝোলার পরিবর্ত্তে এখন সুন্দর সুদৃঢ় লৌহ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার দয়ায় যাত্রীদল অক্লেশে লৌহ সেতু পার হইয়া বদরিকেদার দর্শনে যাইতেছেন। লছমণ ঝোলার সমীপে স্বর্গদ্বার আসিতে হয়। এই স্থানে যাত্রীদল ধ্রুবঘাটে স্নান করিয়া পবিত্র হয়। এই স্থান অতি মনোরম। পাহাড়ের উপর কমলিবাবার ধর্ম্মশালার নীম্নে প্রচণ্ড ভৈরব কল্লোলে গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা হইতেছেন এখানে সাধু সন্ন্যাসী অনেক আছেন। গৃহস্থ লোক বেশী নাই।

গঙ্গার কল ঝঙ্কারে দিক্ সকল মুখরিত হইতেছে। লছমণ-ঝোলা পার হইয়াই উত্তরাখণ্ড যাইবার পথ। তাহার পর সত্যনারায়ণ চটী।

সত্যনারায়ণ চটী।

হরিদ্বার হইতে ৭ মাইল গিয়াই সত্যনারায়ণ চটী। এই স্থানে ৺সত্যনারায়ণ দেবের মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে সত্যনারায়ণ দেবের সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এখানে যাত্রিগণের থাকিবার জন্য চটিও আছে। মিষ্টান্ন পেঁড়া পুরীও পাওয়া যায়। স্থানটি অতি মনোহর। এখানে মুদির দোকানও আছে। প্রত্যহ এই স্থানে সত্যনারায়ণ দেবের ভোগ পূজা আরতি যথাবিধি হইয়া থাকে। এখান হইতে হৃষীকেশ ৭ মাইল মাত্র। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ টাঙ্গী বা ঘোড়ার গাড়িতে যাইতে হয়, এবং রেলও আছে।

হৃষীকেশ।

হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ ১৪ মাইল। এই ১৪ মাইল পথ টাঙ্গা বা ঘোড়ার গাড়িতে যাইতে হয়। এবং হরিদ্বার হইতে সকল যাত্রী হৃষীকেশ দর্শনে আসিয়া থাকেন। হৃষীকেশ লোক-বিশ্রুত স্থান। এখানে অনেক সাধু মহাত্মা বাস করিয়া থাকেন। হৃষীকেশ হইতে দুই তিন মাইল দূরে বাড়ীর ভিতর সাধুগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর আছে। এই স্থানে গঙ্গা চন্দ্রভাগা ও স্বরস্বতী এই তিনের একত্র সঙ্গম হইয়াছে; এজন্য এই স্থানকে ত্রিবেণী তীর্থ বলে। সঙ্গম ঘাটের দুই পার্শ্বে সাধুগণের কুটীর আছে। এই পবিত্র পুণ্যতীর্থ

দর্শনে হৃদয় বিমল আনন্দে পূর্ণ হয়। হৃষীকেশে গঙ্গার অতি মোনহারিণী মূর্ত্তি। গঙ্গাদেবী যেন চঞ্চলা মুখরা বালিকার ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। এখানে স্নানের ঘাটের উপর রামসীতার একটী সুন্দর মন্দির ও ভরতজীর মন্দির ও রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এই স্থানে মহাত্মা কালী কমলী বাবার বৃহৎ ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। এখানে বারমাসই প্রত্যহ বেলা দশটার সময় হইতে ১২টা পর্য্যন্ত চারিশত সাধু ভোজন পাইয়া থাকেন। কমলী বাবার কৃপায় সাধু মহাত্মাগণ পরম আনন্দে এই ধর্ম্মশালায় ভোজন প্রাপ্ত হইতেছেন—ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। হৃষীকেশের বাজারটিও মন্দ নয়। পুরী মিষ্টান্ন দধি দুগ্ধ রাবড়ি সমস্ত এখানে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশালার মধ্যে মুদিখানার দোকানও আছে তাহাতে চাল ডাল ঘি লবণ সমস্ত পাওয়া যায়। স্থানটি বড় শান্তিময়। এই স্থান হইতে কিছুদূরে বাড়ির মধ্যে অনেক সাধু মহাত্মা বাস করেন। এখানে প্রণবানন্দ স্বামীর একটী আশ্রম আছে।

মুনিরেতি।

আমরা লছমনঝোলা পার হইয়া বরাবর উত্তর মুখেই চলিলাম — এক মাইল আসিয়া মুনিরেতি আসিলাম। এই স্থানটীকে মুনিদের তপোবন বলে। এইখানে একটি সরকারি বাংলা আছে। বদরী কেদার যাত্রীগণের সমস্ত মালামাল এইখানে ওজন করিয়া ভাড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এবং ঝাম্পান কাণ্ডি ঘোড়া প্রভৃতি যান বাহনের বন্দোবস্তও হয়, কাণ্ডিওয়ালাদের এই সরকারি লোকেদের

হাত দিয়া অগ্রিম বায়নার টাকাকড়ি দিয়া রসিদ লওয়া হয়। এস্থান অধিকাংশ ঘন বনাকৃত, মধ্যে মধ্যে শ্যামল শৈল গুলি মাথা তুলিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। হরিদ্বার হইতে গঙ্গাদেবীকে আমরা বামে রাখিয়া চলিতেছি। এখানে দুদশ ঘর লোকের বাসও আছে। দু একখানা মুদির দোকানও আছে। তাহার পরবর্ত্তী ফুলেবেড়িয়া চটী। পুস্তকখানি সুদীর্ঘ হইবার ভয়ে সমস্ত চটীর বিস্তারিত বিবরণ লিখিব না। শুধু প্রধান প্রধান স্থান গুলির উল্লেখ করিব। এখানে ধর্ম্মশালা নাই, যাত্রি থাকিবার চটী আছে।

কাণ্ডিচটী।

লছমনঝোলা হইতে ফুলবেড়িচটী মোহনচটী গুলরচটী ছোট বিজনী চটী বড় বিজনী চটী কুণ্ডচটী বাঁদর চটী পার হইয়া কাণ্ডিচটী আসিতে হয়। এই চটী একবারে গঙ্গার উপর। এখানে একটী অশ্বত্থ গাছ আছে। ৪ খানা মুদির দোকান আছে তাহাতে মিষ্টান্নও পাওয়া যায়। এখানকার ঝরণার জলটি সুমিষ্ট। এক মাইল উৎরাই নামিয়া ব্যাসচটী আসা যায়। লৌহ সেতু দ্বারা ব্যাস গঙ্গার পুল পার হইতে হয়। এই স্থানে একটী পথ ব্যাসগঙ্গা হইয়া দেব-প্রয়াগ গিয়াছে দ্বিতীয় পথে নিজামাবাদ যাইতে হয়। ঝোলার অনতিদূরেই ব্যাসগঙ্গা।—ব্যাস গঙ্গার জলটি নির্ম্মল। প্রবাদ আছে ভগবান্ ব্যাসদেব যোগবলে এই স্থানে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া-ছিলেন। এখন পর্য্যন্ত পবিত্র সলিলা জাহ্নবী ব্যাস আশ্রমের পদতল ধৌত করিয়া কুলু কুলু নিনাদে প্রবাহিতা হইতেছেন।

ব্যাসচটী।

ব্যাস গঙ্গা অতি মনোরম স্থান। পাণ্ডারা বলিলেন এই স্থানে গঙ্গাগর্ভে পর্ব্বত শিখরের উপরি ভাগে ব্যাস গুহা আছে। ঐ স্থানে মহাতপা ব্যাসদেব তপস্যা করিতেন। গঙ্গার তটের উপরেই একটি প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আছে। মন্দিরটি বহু পুরাতন, জীর্ণ। ঐ মন্দির মধ্যে মহাত্মা ব্যাসদেবের বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি। ধ্যানস্তিমিত নয়নে তিনি তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছেন। মন্দিরের নিম্নভাগ দিয়া শিবজটা বিহারিণী গঙ্গা ঝঙ্কার করিতে করিতে তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটিতেছেন। এই স্থানটি সুপবিত্র শান্তিময় জনকোলাহলহীন। ব্যাস মন্দিরের সম্মুখ ভাগে একটু সমতল ভূমি আছে। দু'একটী বৃক্ষ আছে, তরু গুলি ধীর সমীরণে ঈষদ্ দুলিতেছে। ব্যাস গঙ্গার উপরে একটি ছোট পুল আছে। এই নদী হিমালয় হইতে দক্ষিণা-ভিমুখী হইয়া চলিয়াছেন। এই ব্যাসগঙ্গা বা ব্যাস চটী অতি প্রসিদ্ধ। আমরা হৃষীকেশ হইতে গঙ্গাদেবীকে বামদিকে রাখিয়া চলিতেছি। এখানে যাত্রিদের থাকিবার চটী ও আহারীয় মিলে। এই স্থানে পর্ব্বত শিখরে গুহামধ্যে ব্যাসদেবের আশ্রম আছে। এবং গঙ্গাতটের উপর একটী বহু পুরাতন জীর্ণ মন্দির আছে, তন্মধ্যে ব্যাসদেবের বিশাল মূর্ত্তি আছে। এ স্থানেও যাত্রীদের থাকিবার জন্য দুই চারিখানা চটী আছে ও মুদিখানার দোকান ও আছে। চাউল ডাল লবণ ঘৃত আটা সবই পাওয়া যায়, আর ঝরণার অযাচিত মধুর জলধারা পড়িতেছে।

দেবপ্রয়াগ।

ব্যাস চটী হইতে ছানুটি চটী উমরানু চটী ও সৌরাটি চটী পার হইয়া বিজনীর নয় মাইল চড়াই ভাঙ্গিয়া দেবপ্রয়াগ আসিতে হয়। গাড়োয়াল জেলার মধ্যে দেবপ্রয়াগ অতি রমণীয় স্থান। বাস্তবিক যেন স্বর্গধাম! অত্যুঙ্গ পর্ব্বত শিখরের উপর ছোট বড় গৃহ গুলি যেন আলেখ্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অলকানন্দার লৌহ সেতু পার হইয়া দেবপ্রয়াগ আসিতে হয়। এখানে স্কুল হাঁসপাতাল থানা কাছারি সবই আছে। এই স্থানে গঙ্গার সহ অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে। এই সঙ্গম দৃশ্য অতি মনোহর। উচ্চ হিমালয় শিখর হইতে স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দা ভৈরব গর্জ্জনে আসিয়া গঙ্গার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মিলনে শুভ্র ফেণিল উর্ম্মিমালা যেন নৃত্য করিতেছে। এই সঙ্গম ঘাটে স্নান করিয়া পিতৃকার্য্যাদি করিতে হয়। সঙ্গম ঘাটের উপর রঘুনাথদেবের মন্দির। মন্দির মধ্যে রাম সীতার সুন্দর মূর্ত্তি আছে ও অন্যান্য দেব দেবীর মূর্ত্তিও আছে। দেবপ্রয়াগের দুইদিকে দুইটী লৌহ সেতু আছে। একটী অলকানন্দার পুল। অপরটি গঙ্গার পুল। পর্ব্বতগাত্রে নানাবিধ তরুলতা গুল্ম ও নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। দূর হইতে দেবপ্রয়াগের অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এখানে হাট বাজার সবই আছে। জিলাপী পূরী পেঁড়া দুধ সমস্তই পাওয়া যায়।

বদরীনাথের সমস্ত পাণ্ডাগণ দেবপ্রয়াগেই বাস করেন। দেবপ্রয়াগের ৭ মাইল দূরে রাণীবাগচটী ও তথা হইতে রামপুরচটী আরও দু চারিটা চটী পার হইয়া বিল্ব কেদার আসিতে হয়।

বিল্বকেশ্বর বা ভীলকেদার।

বিল্বকেশ্বর দর্শন করিয়া তবে শ্রীনগর যাইতে হয়। বিল্বকেশ্বর উচ্চ গিরির উপর অবস্থিত। গঙ্গার তটের উপরি ভাগে ঝরণার পার্শ্বে বিল্বকেশ্বরের মন্দির। মন্দির মধ্যে রজতসর্প মেখলা বেষ্টিত বিল্বকেশ্বর দেবের মূর্ত্তিটি সুন্দর। বাহিরের অঙ্গনে আর একটি শিব মূর্ত্তি আছে। এস্থানে ছায়া শীতল বৃক্ষতলে অনেক গুলি সাধু আছেন। নির্ঝরের কলতানে এই স্থানটি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। স্থানটী অতি নির্জ্জন, নিভৃত, জনমানবশূন্য। চারিদিকে উচ্চ গিরিমালা। গিরিপাদমূলে নির্ঝরিণী কল কল ঝঙ্কারে প্রবাহিতা হইতেছেন। এখানে দুইচারিখানা দোকান মাত্র আছে। কেহ কেহ ইঁহাকে ভীল্লকেদারও বলিয়া থাকেন এখানে যাত্রীদের জন্য চটী আছে। এই স্থান হইতে একটি রাস্তা তিহরি পর্য্যন্ত গিয়াছে এখানে একটি পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নদীর সহ অলকানন্দার মিলন হইয়াছে।

শ্রীনগর।

গাড়োয়াল জেলার প্রধান সহর শ্রীনগর। এই স্থানে হাট বাজার দোকান পুলিশ থানা পোঃ আফিস হাঁসপাতাল স্কুল কাছারি সবই আছে। শ্রীনগরের বিস্তৃত রাজপথের দুইধারে সারি সারি আম্র বৃক্ষ। রাজপথের দুই পার্শ্বেই বিপণী শ্রেণী ও অনেক বাড়ী ঘর অট্টালিকাও আছে। এখানে অনেকগুলি পশমি বস্ত্রের দোকান আছে, সুন্দর সুন্দর কম্বল বিক্রয় হইয়া থাকে। তা ছাড়া পার্ব্বত্য ধাতু শিলাজতু মৃগনাভি চামর প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ পাওয়া যায়।

বিস্তর মেওয়ার দোকান মিষ্টান্নের দোকান আছে। শ্রীনগরের চতুষ্পার্শ্ব উন্নত শৈলমালা বেষ্টিত। তাহার মধ্য দিয়া নির্ম্মলসলিলা অলকানন্দা বেগে প্রবাহিতা হইতেছেন। এখানে কালী কমলীবাবার বৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। এই ধর্ম্মশালায় বোধ হয় ৫ শত লোকের স্থান হইতে পারে। ধর্ম্মশালার অনতিদূরেই কমলেশ্বর মহাদেবের সুবৃহৎ মন্দির। মন্দিরের সন্নিধানে সুন্দর পুষ্পোদ্যান ও একটি ফলের বাগান আছে। গাড়োয়ালবাসীগণ যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি শ্রীনগর হইতেই ক্রয় করিয়া থাকে। এই গাড়োয়াল সহরটি দুইভাগে বিভক্ত। একদিকে স্বাধীন গাড়োয়াল অপর দিকে বৃটিশ গাড়োয়াল। শ্রীনগর হইতে ছয় মাইল পঁউড়ি নামক স্থানে থানা কাছারি আছে। এইস্থানে প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ বাস করেন। এখানে অনেক ঝরণা আছে। ঝরণার জল অতি মধুর। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর।

রুদ্রপ্রয়াগ।

শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ ২৬ মাইল। রুদ্রপ্রয়াগ উচ্চ পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এই স্থানে অলকানন্দার সহ মন্দাকিনীর সঙ্গম হইয়াছে। অত্যুচ্চ কৈলাসশিখর হইতে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী ভীম বেগে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে অলকনন্দার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। এই দুইটী ভীষণ প্রবাহের একত্র মিলনে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য তাহা বর্ণনাতীত। ধবল শুভ্র উর্ম্মিমালা উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রচণ্ড বেগে ভৈরব গর্জ্জনে ছুটিতেছে। অলকানন্দার সেতু পার হইয়া রুদ্রপ্রয়াগ আসিতে হয়। এই সঙ্গম দৃশ্য দর্শনে বিস্ময়ে ভয়ে মন স্তব্ধীভুত হইয়া থাকে। ইহার

ভীমপ্রবাহ এত প্রখর যে কাহার সাধ্য এই সঙ্গমে নামিয়া স্নানকরিতে পারে। তৎক্ষণাৎ প্রবল তরঙ্গে তোমায় কোথায় লইয়া যাইবে। ইহার প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস উপলময় তটভূমিকে ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে, মন্দাকিনীর গভীর গর্জ্জনে কর্ণ বধির হয়। গিরিশিখর হইতে মন্দাকিনী বহু নিম্নে প্রবাহিতা হইতেছে। সঙ্গমে স্নান করিতে হইলে ১০০ টা প্রস্তর সোপান অতিক্রম করিয়া নামিতে হইবে। এই সঙ্গম ঘাটের উপরিভাগে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই পাষাণময় মন্দির মধ্যে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী অতি মনোহর। এখানে ৪।৫ খানা দোকান আছে যাত্রীদের থাকিবার জন্য কয়েকখান চটী আছে। মন্দিরের দ্বারে কয়েকজন সাধু আছেন। এখানে লোকালয় বিরল। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে অলকানন্দার ধারে ধারে কেদারের রাস্তা গিয়াছে। মন্দাকিনীর হিমশীতল বারি স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। এই পথ ধরিয়া আমরা কেদার পুরী গিয়াছিলাম। পথটি বড় সুন্দর বড় সৌন্দর্য্যময়।

কর্ণপ্রয়াগ।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ২৬ মাইল দূরে কর্ণপ্রয়াগ। এইস্থানে কর্ণ-গঙ্গার সহ অলকানন্দার মিলন হইয়াছে। কর্ণগঙ্গার জল স্থির। স্রোতও তত বেশী নাই। এইস্থানে দানবীর কর্ণের মন্দির ও মহারাজ কর্ণ ও তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি আছে। কথিত আছে পুরাকালে কর্ণ মহারাজ এইস্থানে তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। এখানে কর্ণকুণ্ড ও উমাদেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানেও কালী কমলী বাবার

ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে ও থানা ডাকঘর এবং একটী যাত্রীদিগের জন্য সরকারী দাতব্য হাঁসপাতাল আছে। দশ বার খানা দোকানে গরম কাপড় কম্বল প্রভৃতি বিক্রয় হয়। এখানে রাস্তাঘাট ভাল। মিষ্টান্ন দুধ পুরী সবই পাওয়া যায়। কর্ণগঙ্গা হইতে উচ্চ পাহাড়ের উপর চটী। উপরে একটি ঝরণা আছে।

নন্দপ্রয়াগ।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে নন্দপ্রয়াগ ২৪ মাইল দূর। এস্থানে অলকানন্দার সহ ক্ষুদ্রা নন্দানদীর মিলন হইয়াছে, অলকানন্দার বিশাল বক্ষে ক্ষুদ্রা-নন্দা যেন ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। নন্দার জল কালো। অলকানন্দার জল শুভ্র, এখানে নন্দ মহারাজার অনেক কীর্ত্তি আছে। তটের উপরি ভাগে শ্রীচণ্ডিকাদেবী ও নন্দ যশোদা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ আছে এই স্থানে কণ্বমুনি তপস্যা করিতেন। এজন্য ইহাকে কণ্বাশ্রম ও বলে। পাহাড়ের উপর চিত্রবৎ ছোট সহরটী দেখিতে সুদৃশ্য। এখানে ৪।৫ খানা মুদির দোকান কাপড়ের দোকান মিষ্টান্ন পুরীর দোকান আছে। কর্ণপ্রয়াগ হইতে ভোর পাঁচটায় চটী হইতে বাহির হইয়া বদরীবিশাল বলিয়া সকলেই বাহির হইলাম। আবার সেই শ্যামল বনানীর শোভা দেখিতে দেখিতে পথ চলিতে লাগিলাম। ভোরের কুয়াশায় প্রকৃতি যেন শুভ্র ওড়নায় অঙ্গ ঢাকিয়াছেন। তখন জোনাকীর দল গাছে গাছে গাছের আগায় একবার একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। এক একবার নিবিয়া যাইতেছে। পক্ষীগণ প্রভাত বন্দনা গান গাহিতেছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ উন্মুক্ত প্রান্তর

জনমানব হীন। স্থানে স্থানে ঝিল্লিরব ঐক্যতান গান শোনা যাইতেছে। আর বর্ষাবারি বিধৌত সবুজ সস্প মণ্ডিত ধরণীর অপূর্ব্ব শোভা। ঝাঁকে ঝাঁকে নানাবর্ণের পাখীগুলি আসিয়া পাহাড়ের গায় বসিতেছে এবং স্বরলহরী তুলিয়া তুলিয়া বন উপবন প্লাবিত করিতেছে। আর অবিরত নির্ঝরের কলকল শব্দে পথটি মুখরিত করিয়াছে। এই সব দেখিতে দেখিতে আমরা বেলা ১১টায় নন্দপ্রয়াগ আসিলাম। এখানে কয়খানি মুদির দোকান ও চটী ধর্ম্মশালা আছে। পথের পার্শ্বে ছোট বড় শৈলগুলি কোনটী শ্যামল কোনটী পীতাভ পাটলবর্ণের।

ত্রিযুগীনারায়ণ।

কেদার গমনের পথেই ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শন হইয়া থাকে। এই ত্রিযুগী নারায়ণ দর্শনে ৭ মাইল চড়াই পথ ভাঙ্গিতে হয়। অতি দুর্লঙ্ঘ্য শৈলশিখরে ত্রিযুগী নারায়ণ আছেন। পার্ব্বত্য পথ এত সঙ্কীর্ণ যে অতি কষ্টে উঠিতে হয়, প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে যেন হাঁপ ধরে। পথি মধ্যে শাকম্ভরী দেবী আছেন, তাঁহার মন্দিরটী ক্ষুদ্র। কিন্তু দেবীমূর্ত্তি মনোহারিণী। সমুন্নত গিরি চূড়াপরি নারায়ণের সুন্দর সুদৃশ্য একটী মন্দির আছে ও অন্য অন্য দেবদেবীর মন্দির আছে। এখানে সরস্বতী কুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড আছে। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে তিন যুগব্যাপী হোমাগ্নির পূতশিখা উত্থিত হইতেছে। প্রবাদ আছে পুরাকালে এইস্থানে শিবদুর্গার বিবাহ হইয়াছিল। এখনও তিনযুগব্যাপী বিবাহের অগ্নি প্রজ্বলিত আছে। মন্দির অভ্যন্তরে নারায়ণের মনোহর মূর্ত্তি লক্ষ্মীদেবী সহ বিরাজমান। এখানে

শিবদুর্গা গণেশ ও লক্ষ্মী দেবীও আছেন। কালী কমলীবাবার দোতলা ধর্ম্মশালা আছে। এবং যাত্রীদের থাকিবার অনেকগুলি চটী আছে ও সম্মুখে একটী নির্ঝরের ধারা ঝর ঝর রবে পতিত হইতেছে। কয়েকখানা মুদির দোকান ও মিষ্টান্নের দোকান আছে। কিন্তু ত্রিযুগীনারায়ণের চড়াই এবং দুর্গমতা অনেকটা বেশী মনে হয়। ইহার পর চীরবাসা ভৈরব আছেন।

পাতাল গঙ্গা।

গরুড়গঙ্গা চটীর পরই পাতাল গঙ্গা। এস্থানে গঙ্গা একবারে অদৃশ্যা হইয়া পাতালের মধ্য দিয়া কুলুস্বরে প্রবাহিতা হইতেছেন। গঙ্গা দেখা যায় না, শুধু অশ্রান্ত কুলু কুলু রবটি শোনা যায়। এখানে দুখানি মুদির দোকান ও চারি পাঁচখানি চটী আছে। ঝরণার অযত্ন সুলভ জলটি জীবের প্রাণরক্ষা করিতেছে। এখানে লোকালয় বিরল। চারিদিকেই শ্যামল ভূধর শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে। এ স্থানের দৃশ্যটী মনোহর। গিরিপাদ মূলে বসিয়া সুরধনীর ঝঙ্কার শুনিতে শুনিতে কেমন প্রাণের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব্ব ভাব উপস্থিত হয়। মাথার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড মেঘগুলি গজশুণ্ডবৎ নানা আকারে আকাশের গাত্রে শোভা পাইতেছে। সুমন্দ শীতল বায়ুতে শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে। এখানে আমরা একরাত্রি বাস করিয়াছিলাম।

তুঙ্গীনাথ।

ত্রিযুগী নারায়ণের পথেই তুঙ্গীনাথ দর্শনে যাইতে হয়। অত্যুচ্চ শৈলশিখরোপরি তুঙ্গীনাথ অবস্থিত আছেন। এখানে ভয়ানক দুর্গম

গিরিসঙ্কট পথ। ত্রিযুগী নারায়ণ হইতেও তুঙ্গনাথ অনেক চড়াই—বোধ হয় দশ বার মাইল চড়াই হইবে। তুঙ্গনাথও বরফাচ্ছন্ন পথে যাইতে হয়। কেদার বদরীনাথের ন্যায় হিমপাত আরম্ভ হইলে ছয়মাস ইঁহারও পূজাদি পাহাড়ের নীচে চৌপাটিয়া গ্রামে হইয়া থাকে। শীত অবসানে বৈশাখের শেষে আবার তুঙ্গীনাথের মন্দির খোলা হয়। তুঙ্গীনাথ মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তি। ইনি বারমাসেই সেই পার্ব্বত্য শিখরে সঙ্করীর সহ আছেন। তাঁহার রজতময় প্রতিমূর্ত্তিটিতে পাণ্ডারা ছয়মাস চৌপাতায় পূজা করে। ইনি রজত গিরির ন্যায় শুভ্র মনোহর-কান্তি গৌরী সহ সমাসীন আছেন। দেখিলেই মনে হয় কৈলাসপতি শঙ্কর যেন মহাদেবী পার্ব্বতীর সহ উতুাঙ্গ শিখরে বিরাজমান। এই স্থানে যাত্রীদের জন্য কয়েকখানা চটী মুদির দোকান আছে। ত্রিযুগী হইতে তুঙ্গীনাথ ২৪ মাইল।

অগস্ত্য আশ্রম।

যখন আমরা অগস্ত্য আশ্রম আসিয়া পৌছিলাম, দেখিলাম কি সুন্দর অনির্ব্বচনীয় স্থান, কি মহান্ সম্পদে ভূষিত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতের উপরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। নবীন শ্যামল সুকোমল তৃণে আচ্ছন্ন হইয়া যেন একখানি সবুজ গালিছা বিছান রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে শৈলমালা ও অসংখ্য দেবদারু বৃক্ষ-রাশি শোভা পাইতেছে। নব রবি কিরণ সম্পাতে যেন চারিদিক হাসিতেছে। উন্মুক্ত আকাশে করীশুণ্ডের ন্যায় নানাবর্ণের মেঘ নানা রঙ্গে রঞ্জিত, কেমন অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। আশ্রমের সন্নিহিত

স্থানগুলি কেমন নীরব নিস্তব্ধ শান্তিময়। পুষ্পশোভিতা লতাগুলি কেমন মৃদুমন্দসমীরণে দুলিতেছে। পর্ব্বত গাত্রে নানাবর্ণের চিত্রিত প্রস্তররাজি লাল নীল লোহিত পীত নানা আকারে পড়িয়া আছে। মন্দির অভ্যন্তরে ভগবান্ অগস্ত্যদেবের গম্ভীর তাপস মূর্ত্তি ও তৎপত্নী লোপামুদ্রা দেবীর মূর্ত্তিটিও সুন্দর ভাবে সুগঠিত আছে। দেখিতে দেখিতে আকাশে মেঘ দেখা দিল, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বরফাপাত আরম্ভ হইল। আমরা একটি গুহার প্রান্তে বসিয়া অগস্ত্য দেবের অসীম মহিমা, অপার কীর্ত্তির বিষয় ভাবিয়া আনন্দ অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। এই স্থান হইতে যতদূর দৃষ্টি চলে সমুন্নত নীল মেঘের ন্যায় গিরিমালা নভঃস্পর্শী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এই শ্যামল শৈল শ্রেণীর ক্রোড়ে ধবলাকার ন্যায় শুভ্র শুভ্র মেঘ খণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে। কি মহান্ দৃশ্য! কি সুন্দর! গিরিগাত্রে নানাবিধ তরুলতা গুল্ম ও নানাপ্রকার বনফুল ফুটিয়া যেন প্রকৃতি রাণী বিশ্ববিমোহিনী বেশে সজ্জিতা হইয়াছে। বসন্ত সমাগমে তরু পল্লবগুলি নব কিশলয় বাসে আচ্ছাদিত হইয়া নয়নাভিরাম হইয়াছে, বর্ণে সৌরভে সৌন্দর্য্যে যেন বনভূমির শোভা আরও দ্বিগুণ বাড়াইয়াছে। আর বৃক্ষের শাখায় নানাজাতীয় বিহগগণের মধুর কূজনে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। যে দিকে চাই স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া নয়ন ভুলিয়া চায়। মনে হয় এই নীরব প্রশান্ত বনভুমিতে একখানি কুটীর বাঁধিয়া নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহারি ধ্যান করি, যাহার অসীম সৃষ্টি কৌশলে এই বিশ্ব রচনা হইয়াছে তাঁহার সেই বিশ্বরূপ একবার নয়ন মুদিয়া দেখি। মধ্যে মধ্যে গিরি

গাত্র হইতে নির্ঝরের অবিরল জলধারা ঝর ঝর রবে পতিত হইয়া যেন কর্ণকুহরে পরিতৃপ্ত করিতেছে। এই স্থানগুলি কেমন জন-কোলাহল হীন কেমন শান্তিময়! মহামুনি অগস্ত্যের পুণ্যস্মৃতি আজি ও ধরণীর বক্ষে জাগ্রত আছে। এই পুণ্যময় স্থানে আসিলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। নিকটেই একটি ঝরণার স্বচ্ছজল আছে। চারিদিকে দেবদারু বৃক্ষের শ্রেণী সমীরণ ভরে আন্দোলিত হইতেছে। এ স্থানে জনমানব নাই। শুধু অগস্ত্যমুনির মন্দির ও সাধনা ভূমি তাঁহার পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ সাক্ষ্য দিতেছে।

কালীমঠ।

অগস্ত্য আশ্রম হইতে ভট্টিসেরা চটী। রাস্তার পার্শ্ব দিয়া যেন জলের লহর বহিয়া যাইতেছে। পথের দুই পার্শ্বে শস্য ক্ষেত্র। পাহাড়ি রমণী বালক বালিকাগণ যব গোধূম কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে কেহ বা শস্য কর্ত্তন করিতেছে। এস্থানের সন্নিকটে পাহাড়িদের গ্রাম দেখা যাইতেছে, বালকগণ ছাগপাল ও মেষপাল লইয়া চরাইতেছে। এখানে দুচারটি মুদির দোকান আছে ও চটী আছে। এখানে দুগ্ধ মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। ইহার নিকটেই কালীমঠ কালিকাদেবীর মন্দির। মন্দির মধ্যে কালীমাতার মূর্ত্তি।

শিবানন্দী চটি।

শিবানন্দী চটী অতি মনোরম স্থান। অতি সুন্দর। চারিদিকে গাছপালা ও পাহাড়ের উপর একটি ছোট মন্দির।

কথিত আছে মহারাণী অহল্যাবাঈ এই স্থানে আসিয়া স্থানটি অতি মনোরম দর্শনে এই পর্ব্বতের শিখরোপরি একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটি তুষারশুভ্র লিঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপন করাইয়াছিলেন এবং যাত্রীদের জন্য ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। এই পর্ব্বতের পাদমূলে একটী শীর্ণ নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছে। মন্দিরের ভগ্নাংশের মধ্যে ধবল শিবমূর্ত্তি রাণী অহল্যাবাঈয়ের অমর কীর্ত্তির আজিও সাক্ষ্য দিতেছে। উত্তরাখণ্ডের পথের মধ্যে মধ্যে মহারাণী অহল্যার অনেকগুলি ধর্ম্মশালাও আছে। এখনকার মৃদুমন্দ সমীরণ দেহের সন্তাপ নাশ করে ও যাত্রিদের জন্য এখানে কয়েকখান চটী ও মুদির দোকান আছে। এই স্থান হইতে তুষার মণ্ডিত হিমালয়ের রজতগিরির ন্যায় শোভা দর্শন হইয়া থাকে। এখানে বিস্তর দেবদারু বৃক্ষ আছে। নন্দগঙ্গার পুল পার হইয়া নন্দ প্রয়াগ যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে পর্ব্বত গাত্রে শস্যক্ষেত্রগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দেখা যাইতেছে।

গুপ্ত-কাশী।

আজ আমরা গুপ্তকাশী আসিয়া পৌছিয়াছি। এ স্থানটী অতি মনোরম। ভোরে পাঁচটার সময় মুখ হাত ধুইয়া উঠিয়া দেখি, তখন অরুণ-সারথির সপ্তাশ্ব বাহিত রথখানি গগনপথে নিত্য কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য সবেগে আসিতেছে। প্রভাত সূর্য্য কিরণে দশদিক উদ্ভাসিত হইয়াছে, কুসুম সৌরভে দশদিশি সুরভিত হইয়াছে। দেবমন্দিরে প্রভাত আরতির মঙ্গল বাদ্য

বাজিতেছে। গুপ্তকাশী স্থানটি গিরি উপত্যকার উপরিভাগে সংস্থাপিত। সে স্থানে বিশাল পাষাণ মন্দির মধ্যে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা অবস্থিতি করিতেছেন। অন্নপূর্ণা মন্দিরটি বিশ্বনাথ মন্দিরের পার্শ্বেই স্থাপিত। সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে দুইটি কুণ্ড আছে। ঐ দুইটী ঝরণা দুই দিক হইতে জলধারা আসিয়া কুণ্ড মধ্যে পতিত হইতেছে। ইহাকে গুপ্তকুণ্ড বলে, যাত্রীরা এই কুণ্ডে স্নান করিয়া বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করেন। মন্দিরের চারিদিকে বৃক্ষ পাদপ তরু গুল্মও রহিয়াছে। গুপ্ত কাশীতে দেব প্রয়াগের ন্যায় অনেকগুলি ছোট বড় বাড়ী গৃহগুলি পর্ব্বত গাত্রে ছবির ন্যায় আঁকা মনে হয়। এই সকল পার্ব্বত্য স্থানগুলি যেন প্রকৃতির মনোমোহিনী সুষমা ও সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছে। এই স্থান হইতে কেদার গমনের সরল রাস্তা বরাবর গিয়াছে, তবে মধ্যে মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য পার্ব্বত্য পথও আছে।

ওখীমঠ।

ওখীমঠ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। কেদার দর্শনের পথেই ওখীমঠ। শীতাগমে ছয়মাস কাল তুষারপাত হইয়া থাকে। এই ছয় মাস কেদারের পথ বরফ পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ কেদারের পূজা ভোগ আরতি ছয় মাস কাল ওখীমঠেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ওখীমঠটী খুব বড়। বৃহৎ ফটক দিয়া মঠের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। এই স্থানে অনেক দেব দেবী আছেন এবং কেদারনাথ বদরীনারায়ণ আছেন। কেদার নাথের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে; কেদার

নাথের মোহন্তের গদী আছে। এখানে একটী মাত্র কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডের জলে কেদার প্রভুর পূজা ভোগ আদি হইয়া থাকে। এখানে অনেক সাধু মহাত্মা আছেন। ওখীমঠ অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপর। দশ বার খানা মুদির দোকান ও মিষ্টান্নের দোকান আছে। কেদারনাথের মোহন্ত ছয় মাস এই ওখীমঠেই শীতের সময় বাস করিয়া থাকেন। এখানে একটী দাতব্য হাঁসপাতাল আছে। দূর হইতে পর্ব্বতের গাত্রে গৃহগুলি যেন চিত্রিত ছবির ন্যায় বোধ হয়।

গৌরীকুণ্ড।

কেদার নাথের নিম্নেই গৌরীকুণ্ড। লোক বিশ্রুত স্থান। প্রবাদ আছে এই স্থানে গৌরীদেবী তপস্যা করিয়া শঙ্করকে লাভ করিয়াছিলেন। উচ্চ কৈলাস শিখর, মন্দাকিনীর পবিত্রবারি—চতুর্দ্দিকে রজত গিরির হিমালয় শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে—যে দিকে চাও তুষারময়ী ছবি। মন্দাকিণী ভৈরব কল্লোলে প্রচণ্ড প্রবাহে গিরিগাত্র ভেদ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মন্দাকিনীর হিম শীতল বারি হস্তে স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। মন্দাকিনীর কলঝঙ্কারে যেন গিরি শিখর কম্পিত হইতেছে।

এখানে ৮।১০ খানা যাত্রীদের থাকিবার চটী আছে। মুদির দোকানও আছে। যাত্রীদের জন্য হালুয়াইরা লুচি ভাজিতেছে—লুচির সের তিন টাকা। ভারবাহী ছাগ পাল আটা ঘি চিনি লইয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিতেছে। যে দিকে চাই যেন

রূপার পাতে মোড়া পাহাড়গুলি ঝক্‌মক্‌ করছে। এই গৌরীকুণ্ড ঠিক কেদারের পদতলে অবস্থিত। এই স্থান হইতে অভ্রভেদী চির হিমানী মণ্ডিত হিমালয় দেখা যাইতেছে। তদুপরি সূর্য্য কিরণ প্রতিভাত হইয়া যেন সহস্র সহস্র হীরক খণ্ড জ্বলিতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য! যে দিকে চাও ধবলাকার। এই স্থান হইতে কেদার ৩ মাইল। এই দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের পবিত্র স্থানগুলি দেখিলে হৃদয় আনন্দে অভিভূত হয়।

কেদারনাথ।

উত্তরাখণ্ডের প্রধান তীর্থ কেদার বদরী। প্রথমে কেদার দর্শন—তবে বদরীনারায়ণ দর্শন করিতে হয়। কেদারনাথ অপূর্ব্ব তীর্থ—এখানে সমস্তই নৈসর্গিক শোভা। হিমালয় শৃঙ্গের এক দিকে কেদারনাথের মন্দির। রামবারি চটী হইতে কেদার দুই মাইল। এই দুই মাইল—পথের কি সুন্দর শোভা! নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথের দুই পার্শ্বে স্থল পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ পুষ্প বিকসিত হইয়া সমস্ত পথটি আলো করিয়াছে। মধ্যে লতানে বনফুলের সুমিষ্ট সৌরভের সহ শীতল বাতাস বহিতেছে। ঐ সকল পুষ্প বৃক্ষ আপাদ মস্তক পুষ্প স্তবকে আবৃত। কোন স্থানে শুভ্র শ্বেত পদ্মের ন্যায় স্তরে স্তরে ফুটিয়া আছে। মন্দাকিনীর হিম শীতল বারি ও তাহার উপর হিম শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া দেহের রক্ত জমাট করিয়া দিতেছে। চতুর্দ্দিকেই গগনস্পর্শী হিমালয়ের অত্যুচ্চ

শিখর তুষারাচ্ছন্ন হইয়া আছে। যে দিকে চাও ধবল তুষারময়ী ছবি। মস্তকের উপর শুভ্র নির্ম্মল আকাশ। আর পদতলের নিম্নেও সেই শুভ্র ধবল তুষার। এস্থানে প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য। জীবনে এমন সৌন্দর্য্য কখনও দেখি নাই। এটি যেন বাস্তবিকই দেব মার্গ। কি পবিত্র পুণ্যভূমি! এস্থানের অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলে হৃদয় পুলকে পূর্ণিত হইয়া উঠে। এক রকম লতানে গোলাপের শুভ্রবর্ণ পুষ্পরাশি রাশি রাশি ফুটিয়া পথ আলো করিয়া আছে। মন্দাকিনীর হিম শীতল বায়ু সুরভি পুষ্পের বাসে সেই স্থান সৌরভময় হইয়াছে। সত্য সত্যই এই পথ দেব মার্গ বলিয়া বোধ হয়। কেদারের অত্যুচ্চ শিখরোপরি এমন দুর্গম চড়াই রাস্তা এমন দুরারোহতা তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোন কোন স্থানে পথের নির্ণয় নাই। অনন্ত তুষারাচ্ছন্ন ধবলাকার। তার উপর কেদারের প্রচণ্ড শীত হস্ত পদ অবশ অসাড় হইয়া যায়। তাই পাহাড়িরা দলে (কঠিন কেদার) কেদার দর্শন অতি কঠিন; দুর্জ্জয় শীতে ভীষণ কষ্ট। রামবারি ছাড়াইয়া তিন মাইল তুষার আচ্ছন্ন পথ। স্বর্গ গঙ্গা মন্দাকিনী কুলু কুলু নিনাদে উচ্চ কৈলাস পথ হইতে প্রবাহিতা হইতেছেন; কোন কোন স্থানে মন্দাকিনীর জল জমিয়া কঠিন বরফাকারে পরিণত হইয়াছে। তাহার নিম্নে মন্দাকিনী গভীর গর্জ্জনে ছুটিতেছে। কেদারের পথে একটা বরফের সেতু পার হইতে হয়। ক্রমেই চড়াই পথ —যেন মেঘ রাজ্য ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি অমল ধবল শোভা। এই দুর্গম পিচ্ছিল তুষারসিক্ত পথে

চলিতে চলিতে পদে পদেই পদস্খলন হইয়া থাকে। এ স্থানে হিম পাত হেতু বৃক্ষ লতা তৃণের চিহ্ন নাই। কিন্তু সব তুহিনাচ্ছন্ন। শৈলগাত্রে বরফের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীতবর্ণের ফুল ফুটিয়া আছে। এক মাইল পরেই কেদারের মন্দিরের চূড়া দৃশ্য হয়। আরও ছ'মাইল পরে কেদারের পাষাণময় মন্দির। এই মন্দির কত কালের বা কত যুগের তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মন্দিরের শিরোভাগ বরফাবৃত। ভূমি সমস্ত তুষারাচ্ছন্ন। অনেক কষ্টে দড়ির জুতা পায় দিয়া চলিতে হয়। মন্দির অভ্যন্তর গলিত বরফের জলে সিক্ত। কিন্তু মন্দির অভ্যন্তর যেন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ। সম্মুখে বিশালকায় বৃষভমূর্ত্তি। তাহার অনতিদূরেই ঘৃতদীপ জ্বলিতেছে ও বৃহৎ পাষাণকায় কেদারনাথ রহিয়াছেন। তাহার পরেই পার্ব্বতী মূর্ত্তি আছেন। এ যে দেবধাম তাহার আর সন্দেহ নাই। এ স্থানের নীরব প্রশান্ত গম্ভীর ভাব। কেদারের রমণীয় দৃশ্য বর্ণনে আমার মত রমণীর সাধ্য নাই। এ স্থানে ভাষা নীরব, ভাব স্তব্ধ। নগাধিরাজ হিমালয় যেন হিম মুকুট মণ্ডিত হইয়া অনন্ত সৌন্দর্য্য সম্পদে বিভূষিত হইয়াছেন। ইহা যেন প্রকৃতই কৈলাসধাম। পাণ্ডারা বলিলেন এই স্থানে বর্ষার সময় তুষারের উপর শ্বেত কমল প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার সৌরভে দশদিশি ব্যাপ্ত হয়। যাত্রীদের জন্য বরফের উপর কাঠের ঘর খান কত প্রস্তুত আছে, পাহাড়িরা জ্বালানী কাষ্ঠ আনিয়া বিক্রয় করে এবং এখানে ২।৪ খানা মুদির দোকান ও আছে, মিষ্টান্ন পুরী পাওয়া যায়। কিন্তু অসহ্য শীত।

যোশীমঠ।

আমরা সন্ধ্যার সময় যোশীমঠের নিকটবর্ত্তী হইলাম। তখন রাত্রি প্রায় ৭।।০টা বাজিয়াছে। সন্ধ্যার পরই জ্যোৎস্না পুলকিত ধরণীর অপূর্ব্ব শোভা হইল, বনভূমি নীরব প্রশান্ত জনকোলাহল্ল হীন। প্রান্তরের বৃক্ষরাজি লতাপল্লব চন্দ্রের বিমল কিরণে যেন হাসিয়া উঠিল। শীতল শিতকরণের কিরণে জগত যেন স্নিগ্ধ হইয়া গেল। সুদূরে নীল শৈলমালা কৌমূদী কিরণে কি সুন্দর দেখাইতেছিল। এই বনপথে জ্যোৎস্না ফুল্ল যামিনীর মধুর শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা পথ অতিবাহিত করিয়া যোশীমঠে উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যার আরতি হইতেছে, দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শোনা যাইতেছে। আরতির মঙ্গল শঙ্খ বাজিতেছে। আমরা যোশীমঠে প্রবেশ করিয়া। মঠের মুদির একটী কাঁচা মেটে দোতলায় প্রবেশ করিলাম। ঘরটি নিবিড় অন্ধকার। বোধ হয় কতকাল সংস্কার হয় নাই। সেখানে মোট গাঁটরি রাখিয়া নির্ঝরের জলে হাত পা ধুইয়া দেবমন্দির অভিমুখে চলিলাম। যোশীমঠ হইতে বদরীনারায়ণ ২০ মাইল। উত্তরাখণ্ডে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক এই যোশীমঠ স্থাপিত—ইহা সকলেই বলিয়া থাকেন। যোশীমঠ সুপ্রসিদ্ধ মঠ। এই মঠে এখনও মহাত্মা শঙ্করের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি ও গ্রন্থ সকল সযত্নে রক্ষিত আছে। এখানে জ্যোতিশ্বর মহাদেব আছেন। যোশীমঠ হইতে জ্যোতিশ্বর মহাদেবের মন্দির এক মাইল দূরে। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন হইতে

বদরীনারায়ণ প্রভুর দ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তুষারপাত হওয়ায় বদরী প্রভুর দ্বার ছয়মাস কাল রুদ্ধ থাকে। এই ছয়মাস কাল বদরীনাথের ভোগরাগ আরতি প্রভৃতি সমস্তই যোশীমঠে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আর এই যোশীমঠকে জ্যোতির্ম্ময় মঠও বলে। এই স্থানের অনতিদূরেই জ্যোতিশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। উত্তরা খণ্ডের মধ্যে যোশীমঠ সর্ব্ব প্রধান মঠ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন হইতেই বদরীনাথের দ্বার রুদ্ধ হয়, আবার বৈশাখী পূর্ণিমায় দ্বার খোলে। এই ছয় মাস কাল যোশীমঠে নৃসিংহ মূর্ত্তিতেই বদরীনাথ প্রভুর পূজা ভোগরাগ আরতি হইয়া থাকে। বদরীনারায়ণের পুরোহিত রাওলসাহেব ছয় মাস কাল যোশীমঠেই বাস করেন। এখানে নানাবিধ আশ্চর্য্য বৃক্ষলতা খুব দেখা যায় যাহা হিমালয়েই জন্মিয়া থাকে। রাত্রে পর্ব্বত গাত্রে এক প্রকার জ্যোৎস্না তুল্য আলোক বিকীর্ণ হয়। এখানে ডাকঘর থানা হাঁসপাতাল ঔষধালয় সবই আছে, এখানে বৃহৎ ধর্ম্মশালা ও যাত্রী থাকিবার জন্য দোতলা বাটী বিস্তর আছে, এখানে পর্ব্বতজাত ঔষধ মৃগনাভি শিলাজতু চামর প্রভৃতি পাওয়া যায়। যোশীমঠের সন্নিকটে একখানি দোকানে পুস্তকাদি ও বদরী-নারায়ণের মূর্ত্তি বিক্রয় হয়। এখানে অনেক মহাত্মা আছেন। যোশীমঠ হইতে নীতিপাশের রাস্তা। ঐ পথে তিব্বত নেপাল হইয়া সাধু সন্ন্যাসীগণ মানস সরোবর গমন করে। অন্যপথে বদরীনাথ হইয়া কৈলাস যাওয়া যায়।

লালসাঙ্গা বা চামৌলি।

কেদারনাথ হইতে লালসাঙ্গা ২৪ মাইল। এই স্থান হইতে দুইটি রাস্তা দুইদিকে গিয়াছে। দুইটী পথ দুইধার হইতে আসিয়া লানসাঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। অলকানন্দার বৃহৎ সেতু পার হইয়া লালসাঙ্গার বাজারে যাইতে হয়। এ স্থানটি গাড়োয়ালের সব-ডিভিসন। এখানে সরকারি হাঁসপাতাল আছে। অলকানন্দার পুলের উপর হইতে অলকানন্দার সুনির্ম্মল শুভ্র জলরাশি দর্শনে মনে বড়ই আনন্দ হয়। এখানে অনেকগুলি দোকান বাজার আছে। এখানে ডাকঘর থানা পোঃ স্কুল আছে, পার্ব্বত্য দেশে এই পাহাড়ের উপর গ্রাম লোকালয় বহু—নিম্নে অলকা-নন্দার জল; পাহাড়ের উপর দুইটি ঝরণা আছে। এখানে কয়েক খানা মুদির দোকান ও দুইখানা হালুয়াইয়ের দোকান আছে। অলকানন্দার শীতলজলে স্নান করিলে যেন সর্ব্বসন্তাপ দূর হয়।

গরুড়গঙ্গা।

বদরীনাথ দর্শনের পথে গরুড় গঙ্গানামে নদী আছে। ঐ নদী অলকানন্দার সহ মিলিত হইয়াছে। গরুড়গঙ্গার উপরেই গরুড় মহারাজের মূর্ত্তি আছে। এই স্থানে একটি নির্ঝরিণী ঝরঝর রবে নিরন্তর পতিত হইতেছে। প্রবাদ আছে এই গরুড় গঙ্গায় ডুব দিবার সময়ে চক্ষু মুদিয়া যে কোন শিলা একটী তুলিবে, ঐ সকল শিলা বদরীনারায়ণে গরুড় শিলায় স্পর্শ করাইলে ঐটী

বিষপাথর হইয়া সর্প বৃশ্চিক দংশন করিলে ঐ বিষপাথর লাগাইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়। এখানে যাত্রীর জন্য কয়েকখান চটী ও মুদির দোকান আছে। চিঁড়া মুড়ি ছোলাভাজা পাওয়া যায়।

গোপেশ্বর।

এই গোপেশ্বর দর্শন করিয়া কেদার বদরীকার যাত্রীগণ বৈতরণী গঙ্গায় স্নান করিয়া কেদার দর্শনে গমন করিয়া থাকেন। এখানে গোপেশ্বর দেবের একটি বৃহৎ মন্দির আছে। তাঁহার মধ্যে গোপেশ্বরদেব ও অন্যান্য দেবদেবী আছেন এখানে একটী বৃহৎ ইঁদারা আছে ও কয়েকটি ছায়া শীতল বৃক্ষ আছে। এই পথে নিবিড় বনানী পথের দুইধারেই জঙ্গল। আর পাহাড় মধ্যে মধ্যে আখরোট বৃক্ষ ও ভূর্জ্জবৃক্ষ আছে। আমাদের দেশে যেমন সকল জিনিস শালপাতে বাঁধিয়া থাকে এখানে এই ভূর্জ্জপত্রেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি চটীর মাথাগুলা ভূর্জ্জপত্র দিয়া ছাওয়া। আমরা গোপেশ্বর চটীতে আসিয়া বৈতরণীগঙ্গায় স্নান করিয়া দেবদর্শনাদি সমাপনান্তে এখানে চিঁড়ার ফলাহার করিলাম। একটু দুধ পাওয়া গিয়াছিল মুটরিতে চারটি চিড়ে ছিল তাহাই এক মুষ্টি খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে চোপাতা চটীতে পৌছান গেল এই স্থান হইতেই নাকি গন্ধমাদন পর্ব্বত আরম্ভ, কাণ্ডিওয়ালা বলিল ৯ মাইল জঙ্গল আছে। এখানে খানকত মুদির দোকান ও একটী জলের উৎস আছে।

বিষ্ণুপ্রয়াগ।

জোশিমঠ হইতে ক্রমাগত ৸৫ মাইল উৎরাই রাস্তা। রাস্তাটি অতি ভয়ানক গড়ানে পথ যেন প্রাণ হাতে করিয়া নামিতে হয়। এই রাস্তা বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই বিষ্ণুপ্রয়াগ বদরীনারায়ণের দ্বার স্বরূপ। এইস্থানে অলকানন্দার সহ বিষ্ণু গঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে। বিষ্ণুগঙ্গার ভীমগর্জ্জনে যেন কর্ণ বধির হয়। বিষ্ণুগঙ্গা প্রচণ্ড বিক্রমে ভীমগর্জ্জনে অলকানন্দায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন। দূর হইতে বিষ্ণুগঙ্গার প্রবাহ দর্শনে ভয় হয়। সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় দূর হইতে কল্লোল শোনা যাইতেছে। বিষ্ণু গঙ্গারস্রোতঃ এত প্রখর যে কাহার সাধ্য নামিয়া স্নান করে। তটের উপরেই বিষ্ণু ভগবানের মন্দির। পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া ছোট ছোট সিঁড়ি করা আছে। সিঁড়ির দুইপার্শ্বে দুইগাছা শিকল ঝোলান আছে, যাত্রীরা ঐ শিকল ধরিয়া নামিতে পারে। অলকানন্দার তটে দাঁড়াইয়া বিষ্ণুগঙ্গার প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস দর্শন করিলে মনে হয় যে গঙ্গাদেবী যেন যৌবনমদমত্তা যুবতির ন্যায় চঞ্চল পদে ঘোরতর বেগে ছুটিতেছেন—তাঁহার ঝঙ্কারে তটভূমি মুখরিত করিয়াছে।

পাণ্ডুকেশ্বর।

বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে পাণ্ডুকেশ্বর আট মাইল। এ রাস্তা চির দুর্গম—এরূপ কদর্য্যপথ কখনও দেখি নাই। একটি কাঠের কাঁচা পুলে অলকানন্দা পার হইয়া এমন ভয়ানক পথে আসিলাম যে পথের

বর্ণনা করা যায় না। পথ ক্রমাগত চড়াই আর উৎরাই—এ পথে চলা দুর্ঘট। তবে পথের মধ্যে দয়াময় বিশ্বপিতা যাত্রীদের জন্য সকল স্থানেই সুশীতল নির্ঝরের বারি রাখিয়াছেন। কথিত আছে পূর্ব্বকালে মহারাজ পাণ্ডু পুত্র কামনার এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং মুনিগণের নিকট এইস্থানে পুত্রবর লাভ করিয়াছিলেন—সেই কারণে এই স্থানকে পাণ্ডুকেশ্বর বলে। এইস্থানে একটি বহুকালের পুরাতন প্রাচীন মন্দির আছে। তন্মধ্যে পাণ্ডবেশ্বর শিবমূর্ত্তি আছেন ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি ও মহারাজ পাণ্ডুর মূর্ত্তি আছে। এখানে একটি ছোট খাট বাজার ও খানকত দোকান আছে। মুদির দোকান মিষ্টান্নের দোকানও আছে। এখানে পাহাড়িরা বাস করে। কিন্তু হিমপাত হইতে আরম্ভ হইলে এস্থানেও আর কেহ বাস করিতে পারে না। তখন সমস্ত দিগ্‌দেশ তুষারাচ্ছন্ন হয়। এই পর্ব্বতের নাম শতশৃঙ্গ পর্ব্বত। গ্রীষ্মকালে এখানে লোকে বাস করে। তবে পাহাড়ে মাছির উপদ্রবও কম নহে। ছয়মাসের জন্য এখানে দোকান পাট থাকে। শীতের সময় সকলে এস্থান হইতে চলিয়া যায়। এই পাণ্ডুকেশ্বর পঞ্চ বদরীর মধ্যে যোগবদরী নামে উক্ত হইয়া থাকে।

হনুমান চটী।

পাণ্ডুকেশ্বর ছাড়াইয়া আরও অনেকগুলি চটি পার হইয়া হনুমান চটী আসা যায়। হনুমান চটী হইতে বদরীনাথ পাঁচ মাইল। এই হনুমান চটীই বদরীনারায়নের শেষ চটী। এইখানে

শেষধারা প্রস্রবণ আছে। এবং হনুমানজীর মন্দির আছে। এই পথ শুধুই চড়াই—আবার যেন সেই কেদারের মেঘের রাজ্য ভেদ করিয়া উঠিতে হইতেছে। এইস্থানে ভারবাহী ছাগলের পাল অবিচ্ছিন্ন রাস্তা জুড়িয়া চলিয়াছে। তাহাদের গলঘণ্টাগুলি টুং টুং করিয়া বাজিতেছে। এই সকল পাহাড়ি ছাগলের গা বড় বড় লোমে ঢাকা—ইহারা দেখিতেও খুব বড় এবং বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী হিমালয়শৃঙ্গে পাহাড়ের উপর এই ছাগপালগণই মানুষের আহার যোগাইতেছে। ইহাদের পিঠে ছোট ছোট বস্তায় চিনি আটা চাউল লবণ ঘি সমস্ত বোঝাই দিয়া ছাগপালকগণ উঠিতেছে।

লামবগড় চটী।

পাণ্ডুকেশ্বর হইতে লামবগড় চটী আড়াই মাইল। এখানে প্রবল বেগে একটি উৎস ছুটিতেছে। এখানে ঝরণার উপর পুল না থাকায় বরফ গলিয়া এই পথ একবারে জলময় হইয়াছে। এই বরফগলিত হিমশীতল জলময় পথটি পার হইয়া যাওয়া দুরূহ। এখানে খুব চড়াই পথ—চলিতে হাঁপ ধরে; এই গিরিপথ এত সঙ্কীর্ণ যে চলা দুঃসাধ্য। স্থানে স্থানে গহ্বর আছে। একবার পা পিছলাইয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই। এখানে কএকটি চটী ও মুদির দোকান আছে।

বিষ্ণুদ্বার।

লামবগর হইতে বদরীনাথ ৩ মাইল। এই পথটি বরফাচ্ছন্ন। বড় বড় গোলার ন্যায় বরফস্তূপ পড়িয়া আছে—বদরীনাথের মন্দির

বৈশাখের শেষে খোলা হয় ও আশ্বিন পূর্ণিমার পর বন্ধ হইয়া যায়। পাহাড়িরা নিজ নিজ সন্তান সন্ততিগুলি পিঠে বাঁধিয়া ছাগ মেষ চমরী গাই প্রভৃতি লইয়া ছয়মাসের জন্য বদরিকা আসিয়া দোকান পাট বসাইয়া থাকে আবার বদরীনাথের দ্বার বন্ধ হইবার পূর্ব্বে সকলেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যায়। এই দুর্গম হিমালয় শিখরেও পাহাড়ি ছাগপাল আটা ঘি চাউল প্রভৃতি আনিয়া যাত্রীদের প্রাণরক্ষা করিতেছে। অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে যাত্রীদের জন্য আহার্য্য লইয়া যাইতেছে। কেদারবদরী গঙ্গোত্রী প্রভৃতির দুর্গম পার্ব্বত্য পথে ছাগপালই অক্লেশে গমন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে চমরী গাইও দু পাচটী দেখিলাম—ইহাদের পুচ্ছগুলিতেই চামর হইয়াছে। চমরীগাই দেখিতে বড় সুন্দর। শাদা ও কালো দুই রংঙ্গের আছে। ছোট ছোট গাভীগুলি আপন পয়োধর ভারে মন্থর গমনে হাটিতেছে। পুচ্ছ দেশটী চামরের মত দেখা যাইতেছে। এই পথে বড় বড় নির্ঝর হিমালয় গাত্রভেদ করিয়া ঝর ঝর রবে প্রবল বেগে ছুটিতেছে। এ রাস্তা এত দুর্গম যে মোটেই পদব্রজে যাওয়া যায় না। এই স্থান হইতেই নরনারায়ণ পর্ব্বতদ্বয়ের শিখর দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাণ্ডারা বলিয়া থাকে যে সওয়া লক্ষ পর্ব্বত পার হইয়া তবে বদরিকাদর্শন হইয়া থাকে। এ কথাটি অমুলক নহে। হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া বদরিকা পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়। এই স্থানের কিছুদূরেই বৈখানস মুনির আশ্রম। প্রবাদ আছে মরুত্তরাজা সহস্রবর্ষব্যাপি যজ্ঞ এই স্থানেই করিয়া-

ছিলেন। এখনও পর্ব্বত গহ্বরে নাকি যজ্ঞের অঙ্গার রাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হনুমান চটীতে যাত্রীদের থাকিবার জন্য অনেক গুলি চটি আছে এবং পুরি পেঁড়া জিলাপীও মিলিতেছে। এখানে ধর্ম্মশালাও আছে। এইস্থানে ক্ষীরগঙ্গা-নদী অলকানন্দার সহ মিলিত হইয়াছে। এই নদীর জল দুগ্ধের ন্যায়। এই স্থান তুষারাবৃতা। দুইধারে তুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গ পার হইয়া যাইতে হয়।

বদরিকাশ্রম।

উত্তরা খণ্ডের মধ্যে ভারতের প্রধান তীর্থ বদরীনারায়ণ। এই তীর্থ দুর্গম পার্ব্বত্য পথে যাইতে হয়। এই পথে যাইতে দুর্লঙ্ঘ্য গিরি মালা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। বদরী মাহাত্ম্য পুস্তকে লেখা আছে যে এই পথে সার্দ্ধত্রিকোটী তীর্থ আছে। এই সকল তীর্থ গুলি উলঙ্ঘন করিয়া তবে বদরীনারায়ণ ধামে পৌঁছান যায়। এই বদরিকা তীর্থ গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত তিহরীর মধ্যবর্ত্তী। পুরাণে কথিত আছে এই বদরিকা তীর্থই পুরাকালে ব্যাস বশিষ্ঠ শুকদেবের তপস্যাভূমি ছিল। স্বর্গ গঙ্গা অলকানন্দার নিকট বদরিকাশ্রম। বদরিকা প্রবেশ পথেই নর নারায়ণ পর্ব্বতদ্বয় উন্নত আকাস্পর্শী হইয়া যেন প্রহরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। হনুমান চটী হইতে তিন মাইল পথ তুষারাচ্ছন্ন। তবে জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে এই তুষার গলিয়া রাস্তা নির্ণয় হয়। এখন বৈশাখের বিশে তারিখ পথ ঘাট সর্ব্বত্র বরফাবৃত। এই পথ

অতি দুর্গম। পর্ব্বত গাত্র দিয়াই পথ। সে গিরি শৈল গুলি আবার ঢালু। আবার তাহার উপর ধবল গঙ্গা দুগ্ধের ন্যায় বহিয়া যাইতেছেন। এই তুষারাচ্ছন্ন পিচ্ছিল পথে যাইতে বারম্বার পদস্খলন হইয়া থাকে। যদি অসাবধানে কেহ নীচে গড়াইয়া পড়ে তবে পাহাড়ের খদে বা ধবলাগঙ্গার জলেই প্রাণ হারাইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে কাঞ্চন গঙ্গাও বলে। এ স্থানে অভ্রভেদী হিমালয় তুষার মণ্ডিত--যেন দেবাদিদেব রজতগিরিরূপে ধ্যান মগ্ন যোগীর ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যতদূর দৃষ্টি যায় সর্ব্বত্রই বরফস্তূপে আবৃত। এই নগাধিরাজ হিমালয়কে দর্শন করিলে বিস্ময়ে আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই এখানে তুষার পাত হইয়া থাকে। কিন্তু এই অমলধবল প্রকৃতির ভুবনমোহিনী ছবি কোথাও নাই। এখানে ছয় মাসের জন্য দোকানপাট হাট বাজার বসিয়া থাকে এবং সাময়িক পোঃ আফিস একটী বসে। লুচি পেঁড়া জিলাপিও মিলে। আশ্বিন মাসের পরই তুষার পাত হইলেই দরজা বন্ধ হয় ও দোকানপাট উঠিয়া যায়। বদরীনারায়ণের সেবার ভার তিহরির মহারাজার উপর। তিনি রাওল রাজ পুরোহিত দ্বারা নারায়ণের সেবা করাইয়া থাকেন। প্রতি বৎসর প্রায় ২০ ত্রিশ হাজার যাত্রী আসে। এই স্থানকে বিষ্ণুলোক বলে। অলকানন্দের তটের উপর বদরীনাথের মন্দির। মন্দির অভ্যন্তরে কষ্ঠি পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণু মুর্ত্তি। বহুমূল্য রত্নাভরণে সুসজ্জিত বিগ্রহের মস্তকের উপর স্বর্ণছত্র। মন্দির প্রাঙ্গণে গরুড় মহারাজের মুর্ত্তি। বদরীনাথের মূর্ত্তি অতি সুন্দর।

তাঁহার পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী ও পদতলে নারদ উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া স্তব করিতেছেন। এখানে পুরীর ন্যায় মহাপ্রসাদ বিতরণ হইয়া থাকে। এই বদরিকা চির তুষার আচ্ছন্ন। এই স্থান অতি পবিত্র পুণ্য স্থান। পুরাকালে এই বদরিকাশ্রমই শুক সনক নারদ ব্যাসের তপস্যা ভূমি ছিল।

বসুধারা বা ইন্দ্রধারা।

বদরিকা আশ্রম হইতে বসুধারা তিন মাইল পথ। এই তিন মাইল তুষারাচ্ছন্ন পথ। পথের কোন চিহ্ন নাই। ইহার নিকটেই মাতঙ্গী মন্দির। ইহার একটু দূরে যে উচ্চ হিমালয় শিখর হইতে জলধারা পতিত হইতেছে তাহাকে ইন্দ্রধারা বলে। এই জল যেন চন্দন-সুগন্ধময় বিন্দুমাত্র শরীরে পড়িলে অপূর্ব্ব সৌরভ বোধ হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে এই স্থানে পাপ পুণ্যের বিচার হয়, পাপীরা এ জল স্পর্শের অধিকারী হয় না। এই রাস্তা বরফাবৃত হিমালয় শৃঙ্গের উপরিস্থিত। এখানে জনপ্রাণী নাই ইহার দূরে গণেশ গুহা ও ব্যাস গুহা ও ব্যাস আসন আছে। কথিত আছে এই স্থানে বসিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব অষ্টাদশ সংহিতা পুরাণাদি রচনা করিয়াছিলেন। এই ব্যাস আসনখানি নাকি আশ্চর্য্য বস্তু। ইহার চতুর্দ্দিক তুষার আচ্ছন্ন কিন্তু চতুঃষ্কোণ নির্ম্মিত কৃষ্ণ প্রস্তরের আসনখানিতে কিছুমাত্র বরফ পতিত হয় না। এই স্থানের সম্মুখে যে পর্ব্বত আছে তাহাকে ব্যাস পুস্তক বলে। পাহাড়টি ঠিক

পুস্তকাকারে থাকে থাকে সাজান। তাহার পর সত্য পথ। এই পথ দিয়াই পুরাকালে পাণ্ডবগণ মহা প্রস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পর কৈলাস ও মানস সরোবর।

গাড়োয়ালবাসীগণের অবস্থা।

গাড়োয়ালবাসী স্ত্রী পুরুষ বেশ সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর। পাহাড়িরা সত্যনিষ্ঠ সরল স্বভাব—ইহারা মিথ্যা প্রতারণা কপটতা জানে না। এবং ইহারা শান্ত স্বভাব শ্রমসহিষ্ণু। সামান্য আহারে সামান্য পরিচ্ছদেই ইহারা সন্তুষ্ট। ইহারা গোধূম বা যবের রুটী ও বন্য শাক ফল মূল ছাগ মেষ বা কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। পুরুষগণ স্বীয় পরিশ্রমে সুন্দর সুন্দর আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই বলশালী। অনায়াসে দুই মন আড়াই মন বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া উচ্চ পর্ব্বতোপরি উঠিয়া থাকে। গাড়োয়ালবাসিগণ সকলেই চাষ বাস করে। এবং গো মহিষ ছাগ মেষ প্রতিপালন করে। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহারা কেদার বদরী নাইনিতাল মসুরি প্রভৃতি স্থানে মোট বহিয়া, ডাণ্ডি বহিয়া থাকে। এবং যাত্রীদের ঝাম্পান কাণ্ডি বহিবার কর্ম্ম করে। আশ্বিন মাস পড়িলে সকলেই গ্রামে ফিরিয়া আসে। ইহাদের সুন্দর সুন্দর চমরীগাভী আছে। পাহাড়ি পুরুষ ও রমণীগণ কম্বল বুনিয়া থাকে। পাহাড়ি বালক বালিকাগণ গো মেষ-পাল ও ছাগ পাল চরায়। প্রত্যেক পাহাড়ি দুই চারিটা বৃহৎ বৃহৎ পাহাড়ি কুক্কুর পুষিয়া থাকে। এই কুক্কুর এত প্রভুভক্ত যে

পাহাড়ীদের বালক বালিকা শিশুগণকে ও গৃহাদি সমস্তকে কুকুরই প্রহরী হইয়া রক্ষা করে। কুক্কুরগুলি খুব বড় ও বৃহৎ লোমযুক্ত। যব গোধমই ইহাদের এক প্রকার প্রধান খাদ্য। ডাল রুটী পাইলেই পর্য্যাপ্ত ভোজন হইয়া থাকে। ইহারা প্রত্যেকে এক বেলা ⁄১ সের আটা ১ পোয়া ডাল খায় আমাদের দেশের মত ইহারা ম্যালোরিয়ায় জীর্ণ শীর্ণ নয়। ইহারা স্বভাবের ক্রোড়েই লালিত পালিত বর্দ্ধিত। রোগেরও ঔষধের নাম ধাম জানে না।

ইহারা এক একটি জোয়ান লোককে সঙ্গে করিয়া দুলঙ্ঘ্য গিরি শিখর অতিক্রম করে। ইহারা প্রভুভক্ত। আমাদের সঙ্গে পাঁচটী কাণ্ডি ছিল ও পাঁচজন বাহক ছিল। তাহারা অতি বিশ্বস্ত— আমাদের এই দুর্গম পার্ব্বত্য পথে তাহারাই একমাত্র সঙ্গী ছিল আমাদের টাকাকড়ি কাপড় চোপড় সবই তাহারা রক্ষা করিত। ইহাদের নারীগণ খুব শ্রমপরায়ণা। তাহারা পুরুষদের সহ ক্ষেত্রে কাজ করে বীজ বপন করে, ফসল কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া গৃহে লইয়া যায়, শস্য কর্ত্তন করে। ইহারা উচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে কাটবিড়া-লীর মত নামিয়া উঠিয়া থাকে। ও বড় বড় ঝরণা হইতে জলকুম্ভ মস্তকে করিয়া জল আনয়ন করে। ঘাস কাটিয়া গবাদি পশুর জন্য ঘাসের বোঝা মাথায় করিয়া আনে। ইহারা স্বামী পুত্রের সেবা পাক কার্য্য সন্তান পালনও করে। আবার নিত্য ব্যবহার কম্বল বা বস্ত্র বয়ন করে। পাহাড়ি রমণীরা দেখিতে সুন্দর সুস্থকায় গোলাল গঠন। বালক বালিকাগণ যেন ফুটন্ত ফুলের মত। ইহারা

ক্ষণমাত্র অলসতা করিয়া বসিয়া থাকে না। ইহারা শীত প্রধান দেশে বাস করে এজন্য গরম কাপড় ইহাদের প্রচুর প্রয়োজন হয়। আসিবার সময় আমরা কুমাযন জেলা হইয়া আলমোড়া দিয়া ফিরিয়াছিলাম। এস্থানেব জলবায়ু খ্ব উত্তম, স্বাস্থ্য ও ভাল। পাহাড়ীগণ নিজ পরিশ্রমে অন্ন বস্ত্র প্রস্তুত করে—কাহারও উপর নির্ভরতা রাখে না।

সমাপ্ত

গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত।

মা !

আপনার লিখিত শ্রীভাগবত লীলামৃত ও হিমালয় ভ্রমণ পুস্তক দু'খানি পাঠ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। আপনি যেরূপ সম্ভ্রান্ত-বংশের কন্যা, বিদুষী বিদ্যাবতী—আপনার পুস্তক পাঠে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আপনার লেখা সহজ, সরল, মধুর ও কবিত্ব পূর্ণ। লেখা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় আপনি আপনার প্রাতঃস্মরণীয় মাতামহ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের উপযুক্তা দৌহিত্রী। আপনার প্রতিভায় তাঁহার নাম রক্ষা করিয়াছেন। আশা করি আপনার হিমালয় পরিভ্রমণ সকলেরি হৃদয় আকর্ষণ করিবে। ইতি—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

কাশীধাম

আপনার লিখিত শ্রীভাগবতলীলামৃত ও হিমালয়ভ্রমণ পুস্তক পাঠে পরম প্রীত হইয়াছি। আপনার শ্রীভাগবতলীলামৃতের ভাষা যেরূপ সুন্দর, সরল, পরিমার্জ্জিত হইয়াছে তাহা অন্য পুস্তকে বিরল। আপনার হিমালয়ভ্রমণের রচনা অতি মধুর হইয়াছে। আশা করি এই হিমালয় ভ্রমণ পুস্তকখানি, পাঠ করিয়া সকলেই পরম

আনন্দলাভ করিবেন। আপনি যে স্বনামধন্য সুকবি ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দৌহিত্রী তাহা আপনার পুস্তকেই প্রমাণ হইয়াছে। আপনি ভগবদ্ভক্তিময়ী ও বিদূষী—তাহা হিমালয় ভ্রমণ পুস্তকপাঠেই পরিচয় পাইলাম।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন

কাশীধাম

আপনার লিখিত হিমালয় পরিভ্রমণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম সুখী হইলাম। আপনার ভ্রমণবৃত্তান্তটি কবিত্বপূর্ণ সরস ও মধুর হইয়াছে। আশা করি এই পুস্তকখানি পাঠে পাঠক পাঠিকাগণ বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন।

প্রণত

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[illegible]